অধ্যায় ৭

মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা
Human Physiology : Locomotion & Movement

চলন ও **অঙ্গচালনা** প্রাণিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদুটি কাজ সম্পাদনে প্রধানত তিনটি অঙ্গতন্ত্র সক্রিয় থাকে **কঙ্কালতন্ত্র, পেশিতন্ত্র** ও **স্নায়ুতন্ত্র**। চলাফেরা, খাদ্য অন্বেষণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন প্রভৃতি যাবতীয় কাজকর্মের সবই **কঙ্কাল-পেশি** ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কঙ্কাল-পেশির সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে অঙ্গের বা দেহাংশের চলন ঘটে। মানবদেহের ভারবহনকারী শক্ত কাঠামোটি হচ্ছে **কঙ্কালতন্ত্র**। আর এ কঙ্কালতন্ত্রের উপর আচ্ছাদন থাকে **পেশিতন্ত্রের**। এ অধ্যায়ে অস্থি, তরুণাস্থি ও পেশির সমন্বিত ক্রিয়া এবং অস্থিভঙ্গ ও সন্ধির আঘাত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- করোটি
- হাইঅয়েড অস্থি
- সেন্ট্রাম
- অ্যাটলাস
- অ্যাক্সিস
- স্ক্যাপুলা
- ক্ল্যাভিকল
- পেলভিস
- ফ্যালাঞ্জেস
- মেটাকার্পাল
- তরুণাস্থি
- অস্থি
- অস্টিওন
- কন্ড্রোসাইট
- অস্টিওসাইট
- কন্ড্রিন
- স্পঞ্জী অস্থি
- কঙ্কাল পেশি
- হৃৎপেশি
- মসৃণ পেশি
- অস্থিভঙ্গ
- সন্ধির আঘাত

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান ভাগসমূহ চিহ্নিত করা	পাঠ ১	মানুষের কঙ্কালতন্ত্র : অক্ষীয় কঙ্কাল
ব্যবহারিক : মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের অস্থিসমূহ শনাক্তকরণ ও চিত্র অঙ্কন	পাঠ ২	মানুষের কঙ্কালতন্ত্র : উপাঙ্গীয় কঙ্কাল
বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের মধ্যে তুলনা	পাঠ ৩	অস্থি ও তরুণাস্থির গঠন
পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না–এর ব্যাখ্যা	পাঠ ৪	ব্যবহারিক : মানুষের বিভিন্ন অস্থি (মডেল) পর্যবেক্ষণ
ব্যবহারিক : প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা	পাঠ ৫	পেশির গঠন ও কাজ
কঙ্কালের প্রধান কার্যক্রম 'রডস ও লিভারের' একটি তন্ত্র হিসেবে কাজ করে বিশ্লেষণ করা	পাঠ ৬	পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না
মানুষের হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়ের ব্যাখ্যা	পাঠ ৭	ব্যবহারিক : প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা
বিভিন্ন ধরনের অস্থি ও পেশির সমন্বয়ের ব্যাখ্যা	পাঠ ৮	কঙ্কালের কার্যক্রম; রডস ও লিভারতন্ত্র
বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা	পাঠ ৯	হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধিতে আঘাত এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা	পাঠ ১০	অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা
	পাঠ ১১	সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা:স্থানচ্যুতি
	পাঠ ১২	সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা: মচকানো

মানব কঙ্কালতন্ত্র (Human Skeletal System)

ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত অস্থি ও তরুণাস্থি (কার্টিলেজ) নামক যোজক টিস্যু সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, দেহের ভার বহন করে, পেশি সংযোগের স্থান প্রদান করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অঙ্গসমূহ রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানব কঙ্কালতন্ত্রের অধিকাংশই অস্থি নির্মিত। এছাড়া এ তন্ত্রে তরুণাস্থি, টেনডন ও লিগামেন্ট থাকে যারা কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে। মানুষের ৩০ বছর বয়সের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অস্থির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে। মানবদেহের অস্থি নিয়ে অধ্যয়নের বিজ্ঞানকে **মানব অস্থিবিজ্ঞান** বা **হিউম্যান অস্টিওলজি** (human osteology) বলে।

কঙ্কালতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Skeletal System)

মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র নিচে বর্ণিত তিনভাগে বিভক্ত।

১. **বহিঃকঙ্কালতন্ত্র (Exoskeletal system) :** দেহের বাইরে থেকে এদের দেখা যায়। এরা ত্বকের এপিডার্মিস থেকে উদ্ভুত। এজন্য এগুলোকে **ত্বকোদ্ভুত অঙ্গাদি** বলে। নখ, লোম প্রভৃতি এ তন্ত্রের অন্তর্গত।

২. **অন্তঃকঙ্কালতন্ত্র (Endoskeletal system) :** কঙ্কাল বলতে আমরা সাধারণত অন্তঃকঙ্কালকেই বুঝি। এটি অস্থি, তরুণাস্থি এবং লিগামেন্ট নিয়ে গঠিত। দেহের বাহির থেকে এগুলো দেখা যায় না। এটি দুটি প্রধানভাগে বিভক্ত–১. **অক্ষীয় কঙ্কাল** ও ২. **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল**।

৩. **স্প্লানচনিক কঙ্কালতন্ত্র (Splanchnic skeletal system) :** এটি অন্তঃকঙ্কালের অংশ হিসেবে পরিচিত হলেও আলাদাভাবে এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ল্যারিংক্স এর তরুণাস্থি, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই প্রভৃতি এ বিভাগের অন্তর্গত।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ (Functions of Skeletal System)

ক. যান্ত্রিক কাজ (Mechanical functions)

১. **দৈহিক কাঠামো গঠন :** কঙ্কালতন্ত্র মানবদেহের কাঠামো গঠন ও নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

২. **সুরক্ষা :** মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি, যেমন মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতি বিশেষভাবে নির্মিত কঙ্কালে সুরক্ষিত থাকে।

৩. **সংযোগতল সৃষ্টি :** দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন কঙ্কালে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।

৪. **চলন :** অস্থিসন্ধি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কঙ্কালতন্ত্র মানুষের চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।

৫. **ভারবহন :** পেশিসমূহ কঙ্কালের সাথে আটকে থেকে দেহের ভারবহন করে।

খ. শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological functions)

৬. **রক্ত কণিকা উৎপাদন :** পরিণত মানবদেহের রক্ত উৎপাদনকারী প্রধান টিস্যু হচ্ছে **লাল অস্থিমজ্জা**। স্টার্নাম, পাঁজর, কশেরুকা, করোটি এবং ফিমার ও হিউমেরাসের মস্তকে অবস্থিত অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়। অস্থিমজ্জা থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় ২৬ লক্ষ লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। অবিরামভাবে লোহিত কণিকা উৎপাদন ছাড়াও লাল অস্থিমজ্জা অণুচক্রিকা উৎপন্ন করে এবং ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে।

৭. **নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও শ্রবণ :** বক্ষপিঞ্জর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এবং মধ্যকর্ণের কর্ণাস্থি শ্রবণে সহযোগিতা করে।

৮. **রোগ প্রতিরোধ :** অস্থির রেটিক্যুলো এন্ডোথেলিয়ালতন্ত্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।

৯. **খনিজ লবণ সঞ্চয় :** ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চয় করে এবং প্রয়োজনে রক্তে সরবরাহ করে।

১০. **চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা :** দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়ন্ত্রণে ও আয়নিক সমতা রক্ষায় অস্থিগুলো কাজ করে।

১১. **হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ :** অস্থির কোষ থেকে **অস্টিওক্যালসিন** (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহে রক্তের চিনি ও চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২. **রাসায়নিক শক্তি :** মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু লোহিত অস্থিমজ্জা পরিবর্তিত হয়ে পীত অস্থিমজ্জা (yellow bone marrow) গঠন করে। পীত অস্থিমজ্জায় প্রচুর পরিমাণে **অ্যাডিপোজ কোষ** (adepose cell) থাকে যেগুলো দেহের সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে ভূমিকা রাখে।

কঙ্কালতন্ত্রের উপাদান (Components of Skeletal System)

কঙ্কালতন্ত্র পাঁচ ধরনের তন্তুময় ও খনিজসমৃদ্ধ প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত।

১. **অস্থি (Bone) :** অস্থি কঙ্কালতন্ত্রে উপস্থিত একধরনের কঠিন ও ভঙ্গুর যোজক টিস্যু যা প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দিয়ে গঠিত।

২. **কোমলাস্থি বা তরুণাস্থি (Cartilage) :** কোমলাস্থি কঙ্কালতন্ত্রে অবস্থিত একধরনের দৃঢ় অথচ নমনীয় যোজক টিস্যু। এ টিস্যুতে **কন্ড্রিন** নামক ঈষদচ্ছ স্থিতিস্থাপক ম্যাট্রিক্সে তরুণাস্থি কোষগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে।

৩. লিগামেন্ট (Ligament) : লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী হচ্ছে ঘন, শ্বেত বর্ণের তন্তুময় ও স্থিতিস্থাপক বন্ধনী যা দিয়ে একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এগুলো বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক স্থানে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৪. টেনডন (Tendon) : টেনডন হচ্ছে ঘন, মজবুত, শ্বেত বর্ণের নমনীয় ও অস্থিতিস্থাপক তন্তুময় যোজক টিস্যু যা মাংসপেশির প্রান্তে অবস্থান করে পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৫. অস্থিসন্ধি (Joint) : একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে সংযুক্ত হয়ে যে সন্ধিস্থল গঠন করে তাকে **অস্থিসন্ধি** বলে। অস্থিসন্ধি থাকার কারণে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভিন্ন মাত্রায় ও দিকে সঞ্চালন করা যায় ফলে চলন, নড়ন, ভারবহন ও বিভিন্ন কাজকর্ম সহজ হয়।

কঙ্কালতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Skeletal System)

মানবশিশু জন্মের সময় দেহে প্রায় ২৭০টি অস্থি থাকে। তবে পরিণত মানব অন্তঃকঙ্কাল মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত। অস্থির বিভিন্ন স্থানে কোমলাস্থি (তরুণাস্থি) থাকে। মানুষের অন্তঃকঙ্কালতন্ত্রকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়, যেমন– ১. **অক্ষীয় কঙ্কাল** এবং ২. **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল**।

১. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial skeleton) : কঙ্কালতন্ত্রের যে অংশগুলো দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থিত সেগুলোকে **অক্ষীয় কঙ্কাল** বলে। মোট ৮০টি অস্থির সমন্বয়ে অক্ষীয় কঙ্কাল গঠিত। করোটি (skull), মেরুদণ্ড (vertebral column) ও বক্ষপিঞ্জর (thoracic case) দেহের অক্ষীয় কঙ্কাল গঠন করে।

২. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular skeleton) : কঙ্কালতন্ত্রের যে অংশগুলো অক্ষীয় কঙ্কালের দুপাশে প্রতিসমভাবে অবস্থান করে সেগুলোকে **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** বলে। মোট ১২৬টি অস্থির সমন্বয়ে উপাঙ্গীয় কঙ্কাল গঠিত। বক্ষ অস্থিচক্র (pectoral girdle), উর্ধ্ববাহুর অস্থি (fore limb), শ্রোণিচক্র (pelvic girdle) ও নিম্নবাহুর অস্থি (hind limbs) উপাঙ্গীয় কঙ্কাল গঠন করে।

মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো :

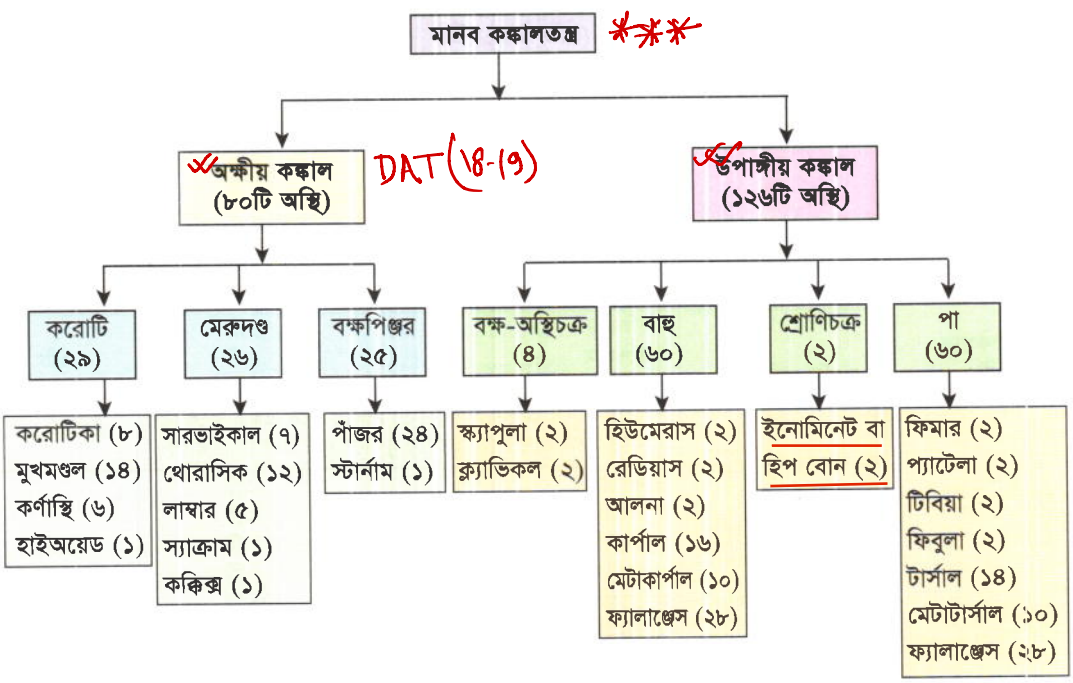

পরিণত মানব কঙ্কালের অস্থিসমূহ (Bones of Adult Human Skeleton) ***

প্রধান ভাগ	অন্তর্ভুক্ত অংশ		বিন্যাস ও সংখ্যা		মোট সংখ্যা
অক্ষীয় কঙ্কাল (৮০টি)	করোটি (২৯টি)	করোটিকা	ফ্রন্টাল অস্থি	১টি	৮টি
			প্যারাইটাল অস্থি	২টি	
			টেমপোরাল অস্থি	২টি	
			অক্সিপিটাল অস্থি	১টি	
			স্ফেনয়েড অস্থি	১টি	
			এথময়েড অস্থি	১টি	
		মুখমণ্ডলীয় অস্থি	ম্যাক্সিলা (উর্ধ্বচোয়াল)	২টি	১৪ টি
			ম্যান্ডিবল (নিম্নচোয়াল)	১টি	
			জাইগোম্যাটিক অস্থি	২টি	
			ন্যাসাল অস্থি	২টি	
			ল্যাক্রিমাল অস্থি	২টি	
			ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা	২টি	
			ভোমার	১টি	
			প্যালেটাইন অস্থি	২টি	
		কর্ণাস্থি	ম্যালিয়াস	২টি	৬ টি
			ইনকাস	২টি	
			স্টেপিস	২টি	
		হাইঅয়েড		১ টি	১ টি
	মেরুদন্ড		সারভাইকাল কশেরুকা	৭টি	২৬টি
			থোরাসিক কশেরুকা	১২টি	
			লাম্বার কশেরুকা	৫টি	
			স্যাক্রাম	১টি	
			কক্সিক্স	১টি	
	বক্ষপিঞ্জর		স্টার্নাম	১টি	২৫ টি
			পর্শুকা (প্রতিপাশে ১২টি)	২৪টি	
উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (১২৬টি)	বক্ষ-অস্থিচক্র		স্ক্যাপুলা	২টি	৪টি
			ক্ল্যাভিকল	২টি	
	বাহু (দুটি)		হিউমেরাস	২টি	৬০টি
			রেডিয়াস	২টি	
			আলনা	২টি	
			কার্পাল	১৬টি	
			মেটাকার্পাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
	শ্রোণি-অস্থিচক্র		ইলিয়াম	১টি	২টি
			ইশ্চিয়াম	১টি	
			পিউবিস	১টি	
			(প্রতিপাশের অস্থিগুলো (৩+৩) মিলিত হয়ে একটি করে হিপ বোন গঠন করে। সে হিসেবে দুপাশে দুটি হিপ বোন থাকে)		
	পা (দুটি)		ফিমার	২টি	৬০টি
			টিবিয়া	২টি	
			ফিবুলা	২টি	
			প্যাটেলা	২টি	
			টার্সাল	১৪টি	
			মেটাটার্সাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
					সর্বমোট = ২০৬ টি

MAT (13-14)
MAT (17-18)
MAT (20-21)
DAT (20-21)

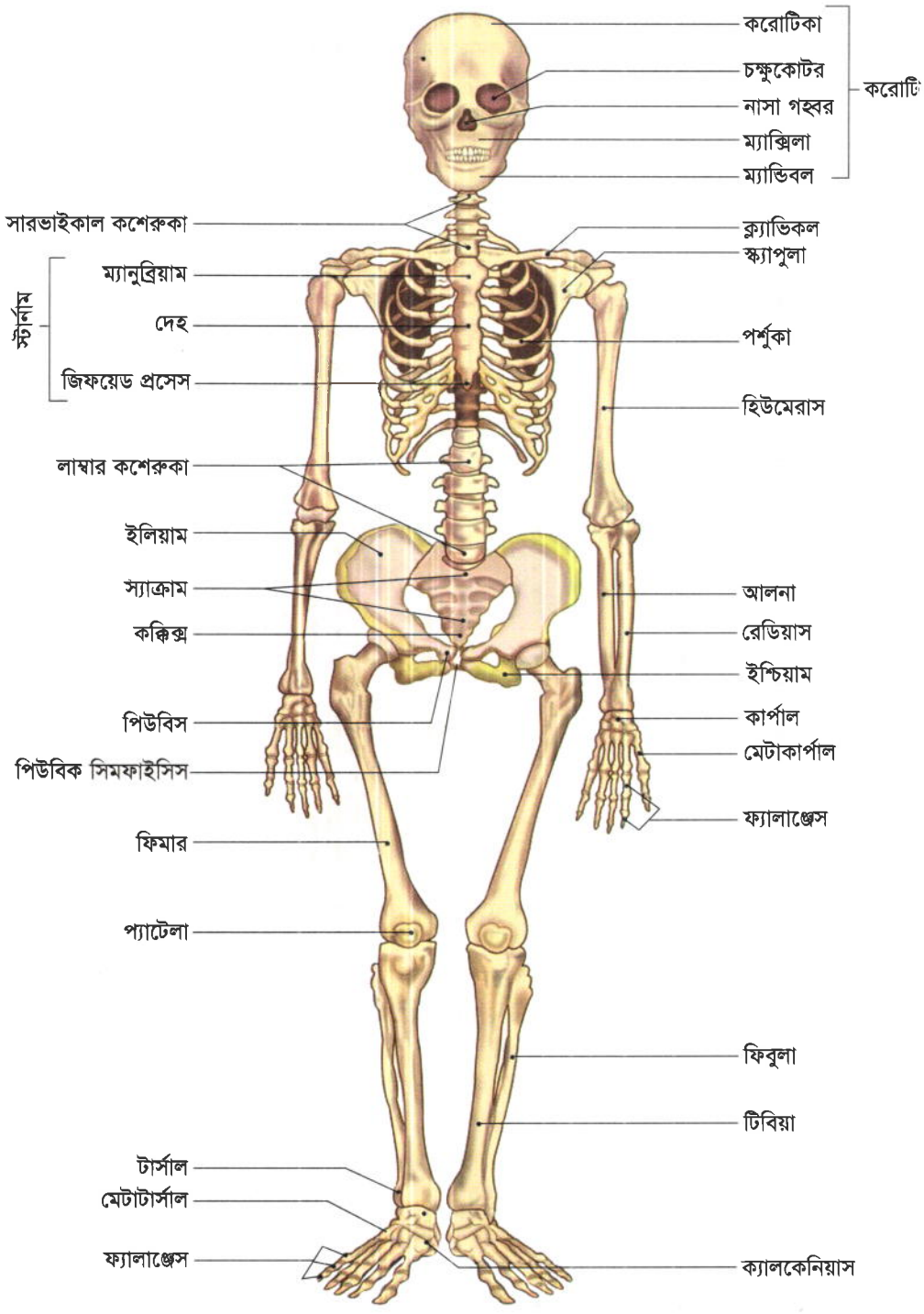

চিত্র ৭.১ : মানব কঙ্কালতন্ত্র

১. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial Skeleton)

কঙ্কালতন্ত্রের যে অস্থিগুলো দেহের লম্ব অক্ষ বরাবর অবস্থান করে কোমল, নমনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ঘিরে রাখে এবং দেহকান্ডের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে অবলম্বন দান করে সেগুলোকে একত্রে **অক্ষীয় কঙ্কাল** বলে।

অক্ষীয় কঙ্কাল **করোটি, মেরুদন্ড** এবং **বক্ষপিঞ্জর**-এ বিভক্ত। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. করোটি (Skull)

মুখমণ্ডলীয় ও **করোটিকা-অস্থি** নিয়ে গঠিত মাথার কঙ্কালিক গঠনকে **করোটি** বলে। ২৯টি অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। করোটির অস্থিগুলো **করোটিকা** বা খুলির অস্থি এবং **মুখমন্ডলীয় অস্থি** এ দুভাগে বিভক্ত।

i. করোটিকা (Cranium) বা মাথার খুলি

করোটির যে অংশ মস্তিষ্ককে আবৃত করে রাখে তাকে **করোটিকা** বলে। ছয় ধরনের মোট আটটি সুগঠিত, চাপা ও শক্ত অস্থি নিয়ে করোটিকা গঠিত। অস্থিগুলো খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও একে অন্যের সাথে **সূচার সন্ধি** (suture joint)-র মাধ্যমে দৃঢ়সংলগ্ন থাকে। মাথার খুলির অস্থিগুলোর বিন্যাস নিম্নরূপ:

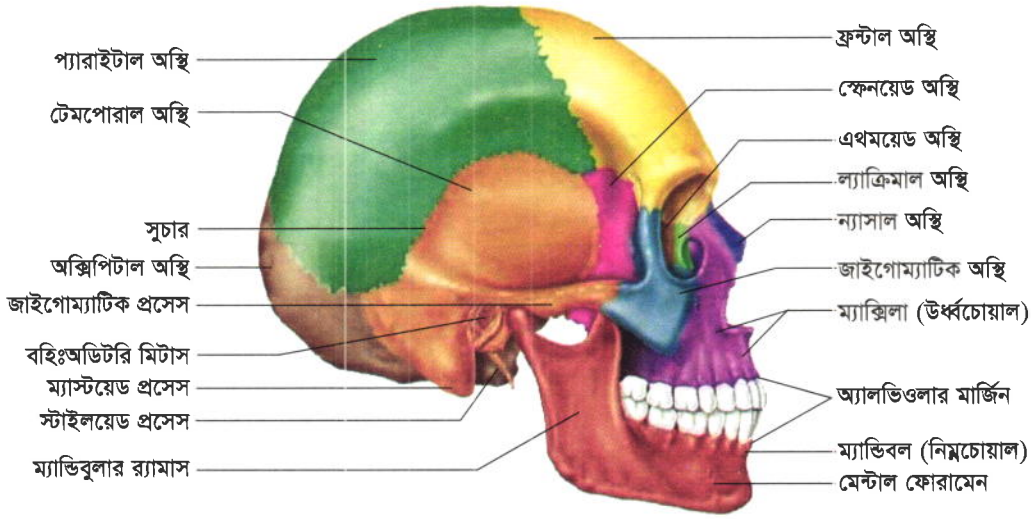

চিত্র ৭.২ : মানুষের করোটি (এ অধ্যায়ের ব্যবহারিক অংশে করোটির সাদাকালো ছবি দেয়া আছে)

১. **ফ্রন্টাল অস্থি (Frontal bone) :** ১টি, খুলির সামনে কপাল গঠনকারী অস্থি।
২. **প্যারাইটাল অস্থি (Parietal bone) :** ২টি, ফ্রন্টাল অস্থির পিছনে খুলির দুপাশে ১টি করে অবস্থিত।
৩. **টেম্পোরাল অস্থি (Temporal bone) :** ২টি, প্রত্যেক প্যারাইটাল অস্থির নিচের দিকে ১টি করে অবস্থিত।
৪. **অক্সিপিটাল অস্থি (Occipital bone) :** ১টি, খুলির পিছন দিকে অবস্থিত। এর নিচের দিকে **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক একটি বড় ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রপথেই মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে।
৫. **স্ফেনয়েড অস্থি (Sphenoid bone) :** ১টি, ফ্রন্টাল অস্থি ও দুই দিকের প্যারাইটাল অস্থির মাঝখানে অবস্থিত।
৬. **এথময়েড অস্থি (Ethmoid bone) :** ১টি, ফ্রন্টাল অস্থির নিচে এবং স্ফেনয়েড অস্থির সামনে অবস্থিত।

করোটিকার কাজ : করোটিকা মস্তিষ্ককে আবৃত ও সংরক্ষিত রাখে।

ii. মুখমণ্ডলীয় অস্থি (Facial Bones)

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশকে **মুখমণ্ডল** বলে। মানুষের করোটিতে ৮ ধরনের ১৪টি অস্থি নিয়ে **মুখমণ্ডলীয় অস্থি** গঠিত। মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলোর বিন্যাস নিম্নরূপ :

১. ম্যাক্সিলা (Maxilla) : ২টি, ঊর্ধ্বচোয়াল গঠনকারী অস্থি।

২. ম্যান্ডিবল (Mandible) : ১টি, নিম্নচোয়াল গঠনকারী অস্থি।

৩. জাইগোম্যাটিক অস্থি (Zygomatic bone) : ২টি, নাকের প্রতি পাশের দিকে চক্ষুর নিচে ১টি করে অবস্থিত।

৪. ন্যাসাল অস্থি (Nasal bone) : ২টি, নাকের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।

৫. ল্যাক্রিমাল অস্থি (Lacrimal bone) : ২টি, **ন্যাসো-ল্যাক্রিমাল নালিপথ** গঠনকারী অস্থি। অক্ষিকোটরের ল্যাক্রিমাল অংশের প্রাচীর গঠন করে।

৬. ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা (Inferior nasal concha) : ২টি, ন্যাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত।

৭. ভোমার (Vomer) : ১টি, চারকোণা চাপা অস্থি, নাসা-ব্যবধায়কের পশ্চাৎ-নিম্নাংশ গঠন করে।

৮. প্যালেটাইন অস্থি (Palatine bone) : ২টি, কঠিন তালু ও নাসাগহ্বরের পার্শ্ব প্রাচীর নির্মাণকারী অস্থি।

[প্রত্যেক কানে ৩টি করে মোট ৬টি অস্থি আছে। জিহ্বার পিছনদিকে বা গোড়ায় **হাইঅয়েড** নামে একটি পাতলা অস্থিও থাকে। এসব অস্থি অস্থিগণনার বাইরে থাকে।]

মুখমণ্ডলীয় অস্থির কাজ : মুখমণ্ডলের অস্থিগুলো সুসজ্জিত হয়ে মুখমণ্ডলের অবয়ব দান করে এবং চোখ, কান, নাক ও মুখ গহ্বরের সৃষ্টি করে। এসব গহ্বরে চোখ, কান, নাক ও দাঁত সুবিন্যস্ত থেকে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ গঠনে ও সংরক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

খ. মেরুদন্ড (Vertebral Column)

অ্যাটলাস (atlas) থেকে **কক্সিক্স** (coccyx) পর্যন্ত প্রলম্বিত, সুষুম্না কান্ড (spinal cord) কে ঘিরে অবস্থিত একসারি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এবং দেহের অক্ষকে অবলম্বনদানকারী অস্থিময় ও নমনীয় গঠনকে **মেরুদণ্ড** বলে। মেরুদন্ডকে শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ৩৩টি অনিয়ত আকৃতির অস্থিখন্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। মেরুদন্ডের প্রত্যেক অস্থিখন্ডককে **কশেরুকা** (vertebra, বহুবচনে vertebrae) বলে।

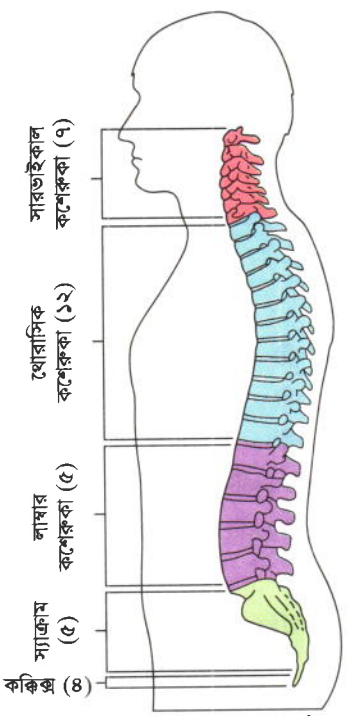

চিত্র ৭.৩ : মানুষের মেরুদণ্ড (পার্শ্বদৃশ্য)

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন

দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন কশেরুকায়ও পার্থক্য দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সকল কশেরুকাই একটি মৌলিক গড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে মানুষের একটি আদর্শ কশেরুকার (মধ্য-বক্ষদেশীয় কশেরুকা) বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. ভার্টিব্রাল বডি (Vertebral body) বা সেন্ট্রাম (Centrum) : কশেরুকার অংকীয়দেশে অবস্থিত বৃহৎ, নিরেট, ডিম্বাকার অংশটির নাম **ভার্টিব্রাল বডি**। এটি কশেরুকার মূল অংশ এবং শক্ত, পুরু ও স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত। এতে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায় যেগুলোর মধ্য দিয়ে রক্তনালি প্রবাহিত হয়। মানুষের কশেরুকা **অ্যাসিলাস** (acoelus) প্রকৃতির অর্থাৎ ভার্টিব্রাল বডির উভয় প্রান্ত সমতল। তরুণাস্থি (fibro-cartilage) নির্মিত **আন্তঃকশেরুকীয় চাকতি** (intervertebral disc)-র সাহায্যে কশেরুকাগুলোর দেহ পরস্পরের সাথে আটকে থাকে।

২. ভার্টিব্রাল আর্চ (Vertebral arch) বা নিউরাল আর্চ (Neural arch) : ভার্টিব্রাল বডির পৃষ্ঠতলে ভার্টিব্রাল ফোরামেনকে ঘিরে অবস্থিত আংটির মতো গঠনটি **ভার্টিব্রাল আর্চ**। দুটি সম-অর্ধাংশ নিয়ে এটি গঠিত। অর্ধাংশের ভার্টিব্রাল বডি সংলগ্ন সরু, খাটো অগ্রভাগকে **পেডিকল** (pedicle) এবং স্পাইনাস প্রসেস সংলগ্ন প্রশস্ত তির্যক পশ্চাৎভাগকে **ল্যামিনা** (lamina) বলে।

৩. ভার্টিব্রাল ফোরামেন (Vertebral foramen) বা নিউরাল ছিদ্র (Neural foramen) : এটি ভার্টিব্রাল বডির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ও ভার্টিব্রাল আর্চ বেষ্টিত গোলাকার বা ডিম্বাকার ছিদ্রবিশেষ। সকল কশেরুকার ফোরামেন উল্লম্বতলে যুক্ত হয়ে **ভার্টিব্রাল ক্যানাল** (vertebral canal) গঠন করে। এর ভিতর সুষুম্নাকাণ্ড ও রক্তনালি সুরক্ষিত থাকে।

৪. স্পাইনাস প্রসেস (Spinous process) বা নিউরাল স্পাইন (Neural spine) : ভার্টিব্রাল আর্চ গঠনকারী দুটি অস্থিপাত ভার্টিব্রাল ফোরামেনের পৃষ্ঠদেশে মিলিত হয়ে যে কাঁটার মতো গঠন সৃষ্টি করে তাকে **স্পাইনাস প্রসেস** বলে। স্পাইনাস প্রসেসের গোড়ার দুদিকের মজবুত অংশের নাম **ল্যামিনা**।

৫. ট্রান্সভার্স প্রসেস (Transverse process) : উভয় পাশে পেডিকেল ও ল্যামিনার সংযোগস্থল থেকে উত্থিত পার্শ্বীয় প্রবর্ধনের নাম **ট্রান্সভার্স প্রসেস**।

৬. আর্টিকুলার প্রসেস (Articular process) বা জাইগাপোফাইসিস (Zygapophysis) : প্রত্যেক কশেরুকায় ক্ষুদ্র চামচের মতো সংযোগকারী প্রবর্ধন বা **আর্টিকুলার প্রসেস** থাকে। এদের দুটি ভার্টিব্রাল আর্চের সামনে এবং দুটি আর্চের পিছনে অবস্থিত। সামনের প্রবর্ধন দুটিকে **সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস** বা **প্রি-জাইগাপোফাইসিস** (pre-zygapophysis) এবং পিছনের প্রবর্ধন দুটিকে **ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস** বা **পোস্ট-জাইগাপোফাইসিস** (post-zygapophysis) বলে। একটি কশেরুকার সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস অন্য কশেরুকার ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসের সাথে যুক্ত থাকে।

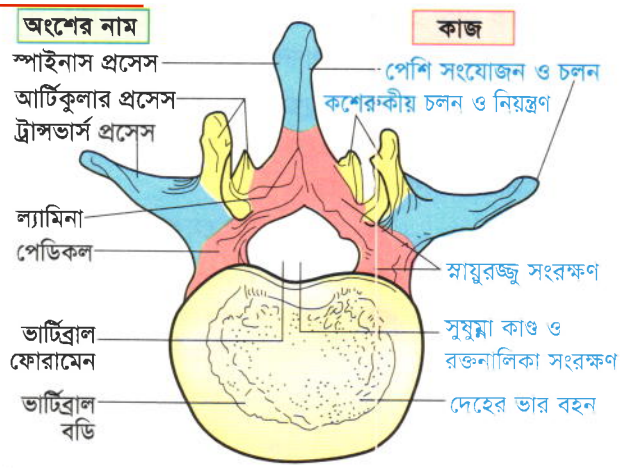

চিত্র ৭.৪ : একটি আদর্শ কশেরুকা (৫ম থেকে ৮ম বক্ষীয় কশেরুকা)

কশেরুকার প্রকারভেদ (Types of Vertebrae)

অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে নিম্নোক্ত ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে;

১. **সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা** (Cervical vertebrae) ..... ৭টি
২. **থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা** (Thoracic vertebrae) ..... ১২টি
৩. **লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা** (Lumbar vertebrae) ..... ৫টি
৪. **স্যাক্রাল (শ্রোণিদেশীয়) কশেরুকা** (Sacral vertebrae) ..... ১টি (৫টি একীভূত)
৫. **কক্কিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা** (Coccygeal vertebrae) ..... ১টি (৪টি একীভূত)

মোট ২৬ টি

পরিণত বয়সে স্যাক্রাল কশেরুকাগুলো একীভূত হয়ে **স্যাক্রাম** (sacrum) এবং কক্কিজিয়ালগুলো **কক্কিক্স** (coccyx) গঠন করে। ফলে, সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কমে ২৬টি হয়।

ব্যবহারিক অংশে বিভিন্ন ধরনের কশেরুকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মেরুদন্ডের কাজ

- দেহকান্ডের সুষ্ঠু সঞ্চালনে মজবুত ও নমনীয় অবলম্বন হিসেবে কাজ করে।
- সুষুম্না কান্ড ও সুষুম্না স্নায়ুমূলকে বেষ্টন ও রক্ষা করে।
- মাথাকে অবলম্বন দেয় এবং **পিভট** (pivot)-এর মতো কাজ করে।
- পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেহের অক্ষরূপে কাজ করে।
- দেহের ভঙ্গি দানে ও চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. বক্ষপিঞ্জর (Thoracic Cage)

পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক কশেরুকা ও অন্যদিকে স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার মতো আকৃতি দান করে, তাকে **বক্ষপিঞ্জর** বলে। মানুষের বক্ষপিঞ্জর একটি **উরঃফলক** বা **স্টার্নাম** (sternum), ১২ জোড়া **পর্শুকা** (ribs) এবং ১২টি **থোরাসিক** বা **বক্ষদেশীয় কশেরুকা** নিয়ে গঠিত হয়।

ক. স্টার্নাম : বক্ষপিঞ্জরের সম্মুখভাগে অবস্থিত চাপা অস্থির নাম **স্টার্নাম**। এর পাশে পর্শুকাগুলো সংযুক্ত থাকে। এটি নিচে বর্ণিত ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা–

i. **ম্যানুব্রিয়াম (Manubrium) :** এটি উপরের ত্রিকোণাকার অংশ। এর সাথে বক্ষ অস্থি **ক্ল্যাভিকল** এবং ১ম পর্শুকা সন্ধি তৈরি করে।

ii. **দেহ (Body) :** এটি মাঝের লম্বা, চাপা ও শক্ত অংশ। এর সাথে ২য় থেকে ৭ম পর্শুকা যুক্ত থাকে।

iii. **জিফয়েড প্রসেস (Xiphoid process) :** এটি একেবারে নিচের দিকের ক্ষুদ্র ও সরু অংশ। প্রথমদিকে এটি তরুণাস্থি নির্মিত হলেও পরিণত বয়সে অস্থিতে পরিণত হয়।

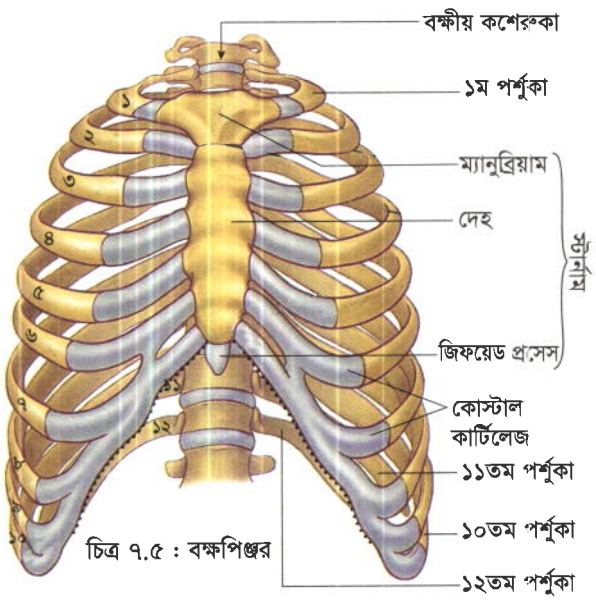

চিত্র ৭.৫ : বক্ষপিঞ্জর

খ. পর্শুকা : এগুলো চ্যাপ্টা, লম্বা ও বাঁকানো অস্থি। এগুলো বক্ষদেশীয় কশেরুকার দুপাশে সংযুক্ত থাকে। পর্শুকায় নিচের অংশগুলো দেখা যায়–

i. **ক্যাপিচুলাম (Capitulum):** এটি পর্শুকার **মস্তক** অংশ। এর সাহায্যে পর্শুকা বক্ষদেশীয় কশেরুকার সেন্ট্রামের সাথে যুক্ত থাকে।

ii. **টিউবারকল (Tubercle) :** মস্তকের সামান্য পরেই **টিউবারকল** অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র উদগত পৃষ্ঠীয় অংশ। এর দ্বারা পর্শুকা একই বক্ষদেশীয় কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সাথে যুক্ত থাকে।

iii. **অ্যাঙ্গেল (Angle) :** পর্শুকার যে স্থান বেঁকে সামনের দিকে প্রসারিত হয় তাকে **অ্যাঙ্গেল** বলে।

iv. **শ্যাফট (Shaft) :** অ্যাঙ্গেলের পরে পর্শুকার যে লম্বা অংশ দেহের সম্মুখভাগে অবস্থান করে তাকে **শ্যাফট** বলে।

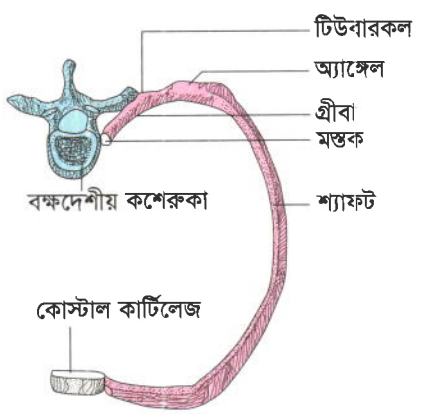

চিত্র ৭.৬ : আদর্শ পর্শুকা

v. কোস্টাল কার্টিলেজ (Coastal cartilage) : পর্শুকা ও স্টার্নামের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী অংশ হচ্ছে **কোস্টাল কার্টিলেজ**। এটি তরুণাস্থিময়।

পর্শুকাগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

- **প্রকৃত পর্শুকা :** এগুলো সংখ্যায় ৭ জোড়া। এগুলো ১ম ৭টি পর্শুকা, বক্ষদেশীয় কশেরুকা থেকে উৎপন্ন হয়ে স্টার্নামে যুক্ত হয়। পর্শুকা ও স্টার্নামের সংযোগস্থলে তরুণাস্থি থাকে। এগুলোকে **কোস্টাল কার্টিলেজ** বা **কোস্টাল তরুণাস্থি** বলে।
- **অপ্রকৃত পর্শুকা :** এগুলো সংখ্যায় ৩ জোড়া। এসব হচ্ছে ৮ম, ৯ম ও ১০ম জোড়া। এগুলো অষ্টম, নবম ও দশম বক্ষদেশীয় কশেরুকা থেকে উৎপন্ন হয়ে স্টার্নামে যুক্ত না হয়ে সপ্তম জোড়া পর্শুকার সাথে যুক্ত হয়।
- **ভাসমান পর্শুকা :** এগুলোর সংখ্যা ২ জোড়া এবং একাদশ ও দ্বাদশ বক্ষদেশীয় কশেরুকা থেকে উৎপন্ন হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

গ. বক্ষদেশীয় কশেরুকা : বক্ষদেশে অবস্থিত মেরুদণ্ডের অস্থিগুলোকে **বক্ষদেশীয় কশেরুকা** বলে। এগুলোর গঠন প্রায় সমান। এদের প্রত্যেকটিতে সেন্ট্রাম, ভার্টিব্রাল আর্চ, স্পাইনাল প্রসেস, ট্রান্সভার্স প্রসেস, ভার্টিব্রাল ফোরামেন এবং পর্শুকা আটকাবার জন্য দুই প্রকার **ফ্যাসেট** (কোস্টাল ফ্যাসেট ও টিউবারকুলার ক্যাসেট) আছে।

বক্ষপিঞ্জরের কাজ : এটি শ্বসন ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করে। এটি শ্বসনের সময় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

২. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular Skeleton)

উর্ধ্বাঙ্গ (দুই বাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও **নিম্নাঙ্গ** (দুই পা ও শ্রোণি-অস্থিচক্র)-এর অস্থিগুলোকে একত্রে **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** বলে।

উর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ

বক্ষ–অস্থিচক্র ও **উর্ধ্ববাহু** নিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২টি করে মোট ৬৪টি অস্থি উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্গত।

ক. বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral Girdle)

মানুষের বক্ষ–অস্থিচক্র ২ জোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–একজোড়া **ক্ল্যাভিকল** (clavicle) ও একজোড়া **স্ক্যাপুলা** (scapula)।

→ MAT (14-15)

- **ক্ল্যাভিকল** দেখতে ইটালিক '*f*' এর মতো বাঁকা অস্থি। এটি একটি দেহ ও দুটি প্রান্ত, যথা **স্টার্নাল** (স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামে যুক্ত থাকে) এবং **অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত** (স্ক্যাপুলায় যুক্ত থাকে) নিয়ে গঠিত।

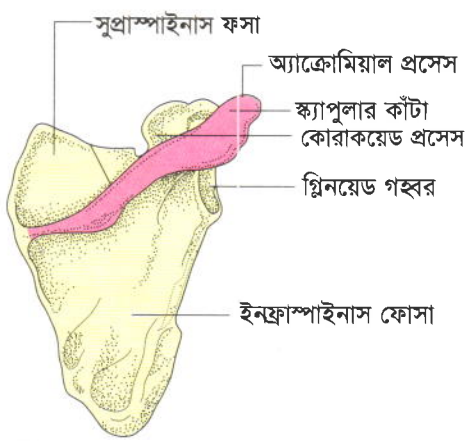

চিত্র ৭.৭ : উর্ধ্ব ডান স্ক্যাপুলা (পৃষ্ঠদেশ)

- **স্ক্যাপুলা** দেখতে চাপা ও ত্রিকোণা অস্থি। এর একটি সম্মুখ বা **কোস্টাল তল** (costal surface), একটি পশ্চাৎ তল, **কোরাকয়েড প্রসেস** (coracoid process), একটি **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (acromial process) এবং **গ্লিনয়েড গহ্বর** (glenoid cavity) নামে একটি সংযোগী অবতল আছে।

সম্মুখ তল পর্শুকাগুলোর দিকে মুখ করে থাকে। এতে **সাবস্ক্যাপুলার ফসা** (subscapular fossa) নামে একটি অবতল অংশ আছে। গ্লেনয়েড গহ্বরে হিউমেরাসের মস্তক আটকানো থাকে।

পশ্চাৎতলে **স্ক্যাপুলার কাঁটা** (spine of scapula) থাকে যা স্ক্যাপুলার পশ্চাৎতলকে **সুপ্রাস্পাইনাস** (supraspinous) ও **ইনফ্রাস্পাইনাস** (infraspinous) ফসা (fossa)-য় বিভক্ত করে।

খ. উর্ধ্ববাহু বা অগ্রপদের অস্থি (Bones of Forelimb or Upper limb)

মানবদেহের কাঁধের অঞ্চল থেকে দুপাশে দুটি বাহু ঝুলে থাকে, এদুটি **উর্ধ্ববাহু**। প্রত্যেক উর্ধ্ববাহু ছোট-বড় ৩০টি অস্থি নিয়ে গঠিত। উর্ধ্ববাহুতে নিম্নোক্ত অস্থিগুলো থাকে–

১. হিউমেরাস (Humerus) : উর্ধ্ববাহুর প্রথম অস্থিকে **হিউমেরাস** বলে। এটি একটি লম্বা, নলাকার হাড়ে গঠিত। এর উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল **হেড** বা **মস্তক** যা স্ক্যাপুলার গ্লিনয়েড গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে। তা ছাড়াও আছে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** এবং এর মাঝখানে **অ্যানাটমিকাল নেক** বা **গ্রীবা** (anatomical neck) নামে একটি খাঁজ।

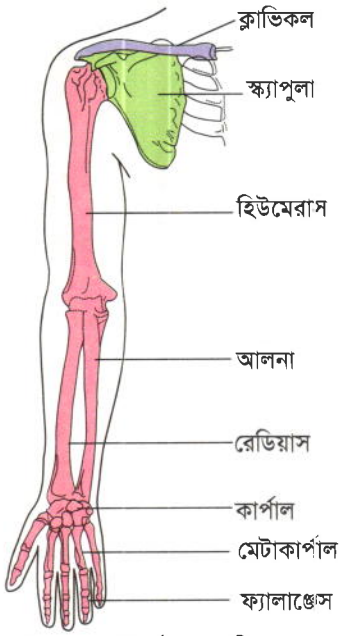

চিত্র ৭.৮ : উর্ধ্ববাহুর অস্থিসমূহ

টিউবার্কলের নিচে যে সরু অংশ থেকে হিউমেরাসের মূল **দেহ** গঠিত হয় তাকে **সার্জিকাল গ্রীবা** (surgical neck) বলে (কারণ, দুর্ঘটনায় এ অংশেই সচরাচর ফাটল ধরে)। মূল দেহের মধ্যভাগে পেশি সংযুক্তির জন্য খসখসে **ডেলটয়েড রিজ** (deltoid ridge) রয়েছে। দেহের কিনারা নিম্নপ্রান্তে এসে **এপিকন্ডাইল** (epicondyle) গঠন করে। এপিকন্ডাইলের নিচে **কন্ডাইল** (condyle) থাকে যা **ক্যাপিচুলাম** (capitulum) ও **ট্রকলিয়া** (trochlea)-য় বিভক্ত।

২. রেডিয়াস-আলনা (Radius–Ulna) : উর্ধ্ববাহুর মধ্যবর্তী অংশ দুটি লম্বা, নলাকার ও ঘনসংলগ্ন অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–**আলনা** ও **রেডিয়াস**। অন্তর্ভাগের অস্থিটি আলনা। এর উর্ধ্বপ্রান্তে **করনয়েড প্রসেস** ও **ওলেক্রেনন প্রসেস**, একটি **ট্রকলিয়ার নচ** ও একটি **টিউবারোসিটি** (অর্বুদ) অবস্থিত। নিম্নপ্রান্ত **মাথা** ও **স্টাইলয়েড প্রসেস**-এ বিভক্ত। রেডিয়াসের উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে একটি খাঁজসহ মাথা, গ্রীবা ও অর্বুদ এবং নিম্নপ্রান্তে কার্পাল অস্থির সংযোগী তল ও একটি স্টাইলয়েড প্রসেস। উর্ধ্বপ্রান্তে রেডিয়াস ও আলনা অ্যানুলার পেশিতে এবং বাকি অংশ অ্যান্টিব্রাকিয়াল ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত থাকে।

৩. কার্পাল অস্থি (Carpal Bones) : দুসারিতে ৪টি করে মোট ৮টি ছোট ছোট বিভিন্ন আকৃতির **কার্পাল** (carpal) অস্থিতে **কব্জি** গঠিত। গোড়ার দিকের সারিতে রয়েছে স্ক্যাফয়েড (নেভিকুলার), লুনেট, ট্রাইকুয়েট্রাল ও পিসিফর্ম অস্থি, এবং প্রান্তের দিকে থাকে ট্র্যাপেজিয়াম, ট্র্যাপেজয়েড, ক্যাপিটেট ও হ্যামেট অস্থি।

৪. মেটাকার্পাল অস্থি (Metacarpal Bones) : হাতের তালু বা করতল (palm) গঠনকারী ৫টি অস্থিকে **মেটাকার্পাল** (metacarpal) বলে। এগুলো লম্বা ও নলাকার এবং একটি গোড়া, শ্যাফট ও মাথা নিয়ে গঠিত।

৫. ফ্যালাঞ্জেস (বহুবচন-Phalanges; একবচন- Phalanx): আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে **ফ্যালাঞ্জেস** বলে। এগুলো খাটো ও নলাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং অন্য আঙ্গুলগুলোতে ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেস থাকে।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ

শ্রোণি–অস্থিচক্র ও **দুপা** নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩০টি করে মোট ৬০টি অস্থি নিম্নাঙ্গের অন্তর্গত। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic Girdle)

এটি **ইলিয়াম** (ilium), **ইশ্চিয়াম** (ischium) ও **পিউবিস** (pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্ক মানবে এ অস্থিগুলো একত্রিত হয়ে **নিতম্বাস্থি** (hip bone) গঠন করে। দুটি নিতম্বাস্থি একত্রে মিলে গঠিত হয় **শ্রোণি-অস্থিচক্র**।

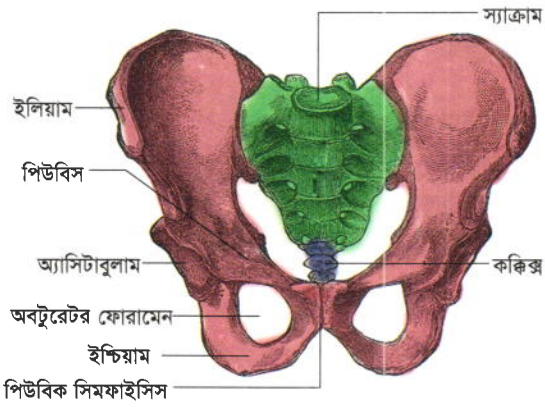

চিত্র ৭.৯ : শ্রোণি-অস্থিচক্র

❐ **ইলিয়াম** দেহ ও ডানায় বিভক্ত। ডানার কিনারাকে ইলিয়াক ঝুঁটি (ক্রেস্ট) বলে। কিনারা দুটি উঁচু অংশে সমাপ্ত হয়েছে, এদের সম্মুখ সুপিরিয়র ও পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা বলে, আর নিচে থাকে সম্মুখ ইনফিরিয়র ও পশ্চাৎ ইনফিরিয়র কাঁটা। তা ছাড়াও ইলিয়ামে আর্কুয়েট রেখা, ইলিয়াক ফসা, গ্লুটিয়াল রেখা ও একটি অরিকুলার সংযোগী তল থাকে।

❐ **পিউবিস** দেহ ও দুটি শাখায় বিভক্ত। শাখা দুটিকে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি (একবচনে–র‍্যামাস) বলে। ঊর্ধ্ব র‍্যামাসে একটি পিউবিক অর্বুদ (টিউবারোসিটি) এবং একটি পিউবিক ঝুঁটি থাকে।

❐ **ইশ্চিয়াম** দেহ, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি, ইশ্চিয়াল অর্বুদ এবং ইশ্চিয়াল কাঁটা নিয়ে গঠিত। কাঁটাটি বড় ইশ্চিয়াল খাঁজকে ছোটটি থেকে পৃথক করেছে। পিউবিক ও ইশ্চিয়াল র‍্যামি অবটুরেটর ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে। ছিদ্রটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে যোজক টিস্যুর ঝিল্লিতে আবৃত। ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের সংযোগস্থলে **অ্যাসিটাবুলাম** (acetabulum) নামে একটি অগভীর অংশ রয়েছে। এতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

শ্রোণি-অস্থিচক্রের কাজ : বস্তিকোটর, মূত্রাশয়, অন্ত্রের নিম্নাংশ প্রভৃতি অঙ্গে অবলম্বন দান করা, ভার বহন করা এবং সুরক্ষা করা শ্রোণিচক্রের কাজ। ফিমারের মস্তক অ্যাসিটাবুলাম-এ যুক্ত থাকে।

পুরুষ ও মহিলার শ্রোণিচক্রের পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পুরুষের শ্রোণিচক্র	মহিলার শ্রোণিচক্র
১. অস্থির গঠন	ভারী এবং আকারে বড়।	হালকা ও আকারে ছোট।
২. পেলভিসের ছিদ্র	অপেক্ষাকৃত ছোট।	অধিকতর বড়।
৩. স্যাক্রাম	সরু।	খাটো, প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা।
৪. পিউবিক সিমফাইসিস	অগভীর।	গভীরতর।
৫. অ্যাসিটাবুলাম	বড়, পার্শ্ব অভিমুখী।	ছোট, সম্মুখ অভিমুখী।

Ilium ও Ileum এর মধ্যে পার্থক্য

Ilium	Ileum
১. মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রোণিচক্রের একটি বিশেষ অস্থি।	১. সকল মেরুদণ্ডী ও কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের পৌষ্টিকনালির ক্ষুদ্রান্ত্রের একটি অংশ।
২. ডানার মতো আকার।	২. সরু নালি বিশেষ।
৩. অস্থি নির্মিত।	৩. বিভিন্ন পেশিস্তরে গঠিত।
৪. ফিমারকে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত রাখে।	৪. খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে।

খ. নিম্নবাহু বা পশ্চাৎপদের অস্থি (Bones of Hindlimb or Lower limb)

১. ফিমার (Femur) : নিম্নবাহুর প্রথম অস্থিকে **ফিমার** বলে। এটি মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থি। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি গোল হেড (মস্তক), নেক (গ্রীবা) এবং ছোট ও বড় **ট্রোক্যান্টার** অবস্থিত। দেহটি শক্ত ও নলাকার। এর পশ্চাৎতল একটি অমসৃণ আলযুক্ত। নিম্নপ্রান্ত দুটি কন্ডাইলবিশিষ্ট। দুই কন্ডাইলের মাঝখানে থাকে আন্তঃকন্ডাইলার ছিদ্র, প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুপাশে একটি করে **এপিকন্ডাইল** নামে সামান্য উঁচু জায়গা।

ফিমারের প্রান্তে **প্যাটেলা** (patella) নামে একটি প্রায় ত্রিকোণাকার অস্থি অবস্থিত। প্যাটেলা একটি সিসামায়েড অস্থি (sesamoid bone), কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেনডন থেকে। প্যাটেলার পশ্চাৎভাগের ঊর্ধ্বাংশ ফিমারের সাথে এবং নিম্নাংশ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত।

২. টিবিয়া-ফিবুলা (Tibia-fibula): নিম্নবাহুর মধ্যবর্তী অংশে দুটি অস্থি থাকে, যথা–**টিবিয়া** ও **ফিবুলা**।

টিবিয়া বেশি মোটা। এর ঊর্ধ্বপ্রান্ত দুটি কন্ডাইল, একটি আন্তঃকন্ডাইলার স্ফীতি, ফিমারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য দুটি সংযোগী তল এবং পেশি সংযোজনের জন্য একটি **টিউবারোসিটি** বহন করে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর সম্মুখ কিনারা **ঝুঁটি** নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্নপ্রান্তে **ম্যালিওলাস** নামে দুপাশে উঁচু অংশ আছে। এতে ট্যালাস, (টার্সাল অস্থি)-এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে।

ফিবুলা দেখতে একটি দীর্ঘ যষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের। ঊর্ধ্বপ্রান্তে টিবিয়ার সংযোগের জন্য একটি সংযোগী তল আছে। নিচের প্রান্তে থাকে **ম্যালিওলাস**।

৩. টার্সাল অস্থি (Tarsal bones) : পায়ের গোড়ালি ও পদতলের পশ্চাৎ অর্ধাংশ গঠনকারী অস্থিসমূহের নাম **টার্সাস** (tarsus)। পাঁচ ধরনের ৭টি টার্সাস দুই সারিতে সজ্জিত থাকে। টার্সাসগুলো হচ্ছে– একটি করে ট্যালাস, ক্যালকেনিয়াস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও ৩টি কুনিফর্ম।

৪. মেটাটার্সাল অস্থি (Metatarsal bones) : এক সারিতে অবস্থিত পাঁচটি ক্ষুদ্র লম্বাকার **মেটাটার্সাস** (metatarsus) পদতলের সম্মুখ অর্ধাংশ গঠন করে।

৫. ফ্যালাঞ্জেস (Phalanges) : পায়ের আঙুলের অস্থিগুলোকে **ফ্যালাঞ্জেস** বলে। বৃদ্ধাঙ্গুলে দুটি এবং অন্যান্য আঙুলে তিনটি করে প্রতি পায়ে মোট ১৪টি করে ফ্যালাঞ্জেস বিদ্যমান।

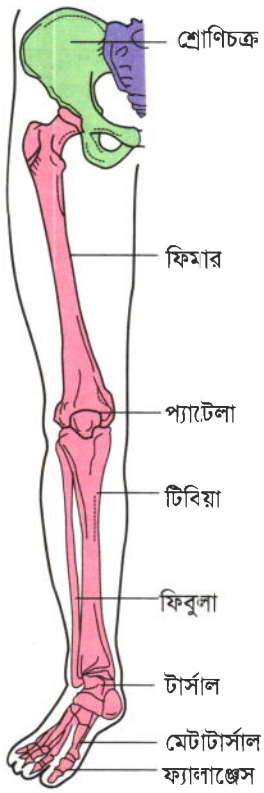

চিত্র ৭.১০ : মানুষের পায়ের অস্থি

অস্থি ও তরুণাস্থি (Bone and Cartilage)

যে যোজক টিস্যু পরিবর্তিত হয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণিদের কাঠামো গঠনসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ভার বহন করে তাকে কঙ্কাল যোজক টিস্যু বলে। ম্যাট্রিক্স ও কোষের গঠন অনুযায়ী কঙ্কাল যোজক টিস্যু দুপ্রকার–অস্থি ও তরুণাস্থি।

অস্থি বা অসিয়াস টিস্যু (Osseous Tissue)

মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্স (matrix)-**এর জৈব উপাদানের সাথে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জাতীয় অজৈব লবণ জমা হয়ে যে সুদৃঢ় ও কঠিন ভারবাহী টিস্যু সৃষ্টি হয় তাকে অস্থি বলে।**

অস্থির বৈশিষ্ট্য

১. **পেরিঅস্টিয়াম** (periosteum) নামক দ্বিস্তরী আবরণে অস্থি আবৃত থাকে।
২. মাতৃকা অনমনীয়, অস্থিতিস্থাপক ও কঠিন প্রকৃতির।
৩. মাতৃকায় **জৈব পদার্থ** ৪০% এবং **অজৈব পদার্থ** ও **অস্থিকোষ** থাকে প্রায় ৬০%।
৪. জৈব পদার্থের মধ্যে **কোলাজেন তন্তু** ও **অসেইন** (ossein) নামক মিউকো-পলিস্যাকারাইড থাকে।
৫. অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট (৮৫.৬২%), ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (৩.৫৭%), ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট (১.৭৫%) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
৬. মাতৃকায় ৪ ধরনের অস্থিকোষ ছড়ানো থাকে– *i.* অস্টিওপ্রোজেনিটর কোষ (osteoprogenitor cell), *ii.* অস্টিওব্লাস্ট (osteoblast), *iii.* অস্টিওক্লাস্ট (osteoclast) ও *iv.* অস্টিওসাইট (osteocyte)।
৭. প্রাণীর দেহে সবচেয়ে কঠিন, শক্ত ও ভঙ্গুর প্রকৃতির যোজক টিস্যু।

RMDAC

অস্থির প্রকারভেদ (Types of Bones)

উপাদানের ঘনত্ব, দৃঢ়তা ও গঠনের ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: যেমন--**নিরেট অস্থি** (compact bone) এবং **স্পঞ্জি অস্থি** (spongy bone)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. নিরেট অস্থি (Compact bone) বা কর্টিকেল অস্থি (Cortical bone) : এগুলো দৃঢ়, নিরেট ও ভঙ্গুর প্রকৃতির অস্থি। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ৮০% নিরেট অস্থি। নিরেট অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে (৫-১৫টি) বিন্যস্ত। স্তরগুলোকে **ল্যামেলি** (lamellae) বলে। ল্যামেলি একটি সুস্পষ্ট নালির চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় এ নালিটি হচ্ছে **হ্যাভারসিয়ান নালি** (haversian canal)। প্রত্যেক হ্যাভারসিয়ান নালি ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলির সমন্বয়ে একটি **হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র** (haversian system) বা **অস্টিওন** (osteon) গড়ে উঠে। আবিষ্কারক **ক্লোপটন হ্যাভারস** (Clopton Havers, 1657-1702)-এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক ল্যামেলায় (একবচন) **ল্যাকুনা** (lacuna) নামে কতকগুলো ক্ষুদ্র গহ্বর পাওয়া যায়। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভিতরে অবস্থান করে। প্রত্যেক ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম কতকগুলো নালিকা বেরোয়। এদের **ক্যানালিকুলি** (canaliculi) বলে। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো পরস্পরের আড়াআড়ি নালি দিয়ে যুক্ত থাকে। এসব নালিকে বলে **ভকম্যানস ক্যানাল** (Volkmann's canal)। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রগুলোর অন্তর্বর্তীস্থানে কঠিন মাতৃকা ও অস্থিকোষ উপস্থিত থেকে অস্থি সুদৃঢ় করে। অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহ্বর থাকে তার নাম **মজ্জা গহ্বর** (marrow cavity)। গহ্বরটি এন্ডোস্টিয়াম (endosteum) পর্দা দিয়ে আবৃত এবং **লাল** বা **হলুদ মজ্জা** (red or yellow bone marrow)-য় পূর্ণ থাকে। মানুষের উপাঙ্গীয় কঙ্কালের অধিকাংশ হাড়, যেমন-হিউমেরাস, রেডিয়াস আলনা, ফিমার, টিবিয়াস, ফিবুলা ইত্যাদি নিরেট প্রকৃতির।

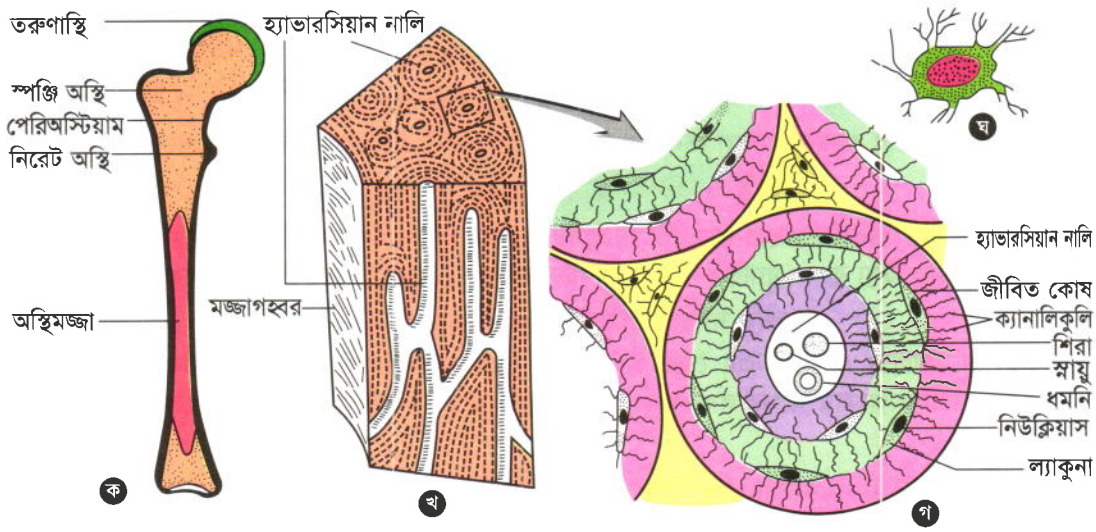

চিত্র ৭.১১ :অস্থির বিভিন্ন অংশ; (ক) লম্বচ্ছেদ; (খ) নিরেট অস্থির অংশবিশেষ; (গ) হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র; (ঘ) একটি অস্থিকোষ

২. স্পঞ্জি অস্থি (Spongy bone) : নিরেট অস্থির ভিতরে অবস্থিত স্পঞ্জি অস্থি অপেক্ষাকৃত হালকা, অসংখ্য কুঠুরিযুক্ত স্পঞ্জের মতো। যেসব অস্থির গঠন স্পঞ্জ বা মৌচাকের মতো সেগুলোকে **ক্যানসেলাস** (cancellous) বা **ট্রাবেকুলার** (trabecular) **অস্থি** বলে। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি। স্পঞ্জি অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একককে **ট্রাবেকুলা** (trabecula) বলে যা ল্যামিলি, অস্থিকোষ ল্যাকুনি ও ক্যানালিকুলির সমন্বয়ে গঠিত। ট্রাবেকুলাসমূহের মধ্যবর্তীস্থান **লোহিত অস্থিমজ্জায়** পূর্ণ থাকে। অস্থি আবরণ **পেরিঅস্টিয়াম** থেকে রক্তনালিকা

ট্রাবেকুলাতে প্রবেশ করে অস্থির কোষমূহকে পুষ্টি সরবরাহ করে। স্পঞ্জি অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণের পরিমাণ কম থাকে। এতে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না। স্তন্যপায়ীদের করোটিকা, চাপা হাড়, বড় অস্থির প্রান্তভাগ এবং পাখিদের সকল অস্থি স্পঞ্জি ধরনের। **শিশুদের প্রায় সকল অস্থিই স্পঞ্জি প্রকৃতির।**

আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবদেহের অস্থিগুলোকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়–

১. লম্বা অস্থি : যে সব অস্থির মধ্যভাগ নলাকার, প্রান্তদুটি স্ফীতকায় ও অস্থিসন্ধি দিয়ে অন্য অস্থির সাথে যুক্ত থাকে এবং নলাকার অংশের কেন্দ্র অস্থিমজ্জাপূর্ণ, সেগুলো **লম্বা অস্থি**। যেমন– হিউমেরাস, ফিমার ইত্যাদি।

২. খাটো বা ক্ষুদ্র অস্থি : যে সব অস্থির আকৃতি ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট দৃঢ় হওয়ায় বেশি চাপ সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন, সেগুলো **খাটো বা ক্ষুদ্র অস্থি**, যেমন–করতল ও পদতলের অস্থি।

৩. চাপা অস্থি : যে সব অস্থি বিশেষ প্রয়োজনে বড় হয়ে থালার আকৃতি ধারণ করে, সেগুলো **চাপা অস্থি**, যেমন– স্ক্যাপুলা, পর্শুকা, স্টার্নাম, করোটির প্যারাইটাল অস্থি প্রভৃতি।

৪. অনিয়ত অস্থি (Irregular bones) : একই শ্রেণির অস্থির মধ্যে যখন আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, তখন তাদের **অনিয়ত অস্থি** বলে, যেমন– কশেরুকা।

৫. বায়ুপূর্ণ অস্থি (Pneumatic bones) : মানবদেহের যে সব অস্থি বায়ুপূর্ণ স্থানযুক্ত বা রক্তপূর্ণ গহ্বরযুক্ত এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাসাগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত সেগুলো **বায়ুপূর্ণ অস্থি**। যেমন– উপরের চোয়াল (ম্যাক্সিলা)।

নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে পার্থক্য ***

নিরেট অস্থি	স্পঞ্জি অস্থি
১. **হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র** নামক একক-এ গঠিত।	১. **ট্রাবেকুলা** নামক একক-এ গঠিত।
২. ঘন, ভারী ও মজবুত ধরনের।	২. পাতলা, হালকা ও অসংখ্য কুঠুরীযুক্ত স্পঞ্জের মতো।
৩. এটি অস্থির বাইরের প্রধান স্তর গঠন করে।	৩. এটি নিরেট অস্থির ভিতরে অবস্থান করে।
৪. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ৮০% নিরেট অস্থি।	৪. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি।
৫. ফিমার ও হিউমেরাস এধরনের অস্থি।	৫. স্তন্যপায়ীদের করোটিকা, চাপা হাড়, বড় অস্থির প্রান্তভাগ এবং পাখিদের সকল অস্থি স্পঞ্জি ধরনের।

অস্থির কাজ (Functions of Bones)

অস্থি মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ সম্পাদন করে, যেমন–

ক. যান্ত্রিক কাজ (Mechanical functions)

১. দেহের কাঠামো গঠন : অস্থি দেহের দৃঢ় ও মজবুত স্থাপত্য কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি প্রদান করে।

২. নমনীয় অঙ্গাদির রক্ষণাবেক্ষণ : দেহের কোমল অঙ্গ, যেমন– মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, সুষুম্না কাণ্ড, চোখ, কান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কোমল অঙ্গগুলোকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

৩. ভার বহন : পেশিগুলো অস্থির সাথে আটকে থেকে দেহের অন্যান্য কোমল অঙ্গের ভার বহন করে।

৪. চলন : দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন অস্থিতে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।

খ. শারীরবৃত্তীয় কাজ (Physiological functions)

৫. রক্তকণিকা উৎপাদন : শিশুদের সকল অস্থির লোহিত অস্থিমজ্জা থেকে রক্তকণিকা তৈরি হয়। পরিণত মানুষে করোটি, পর্শুকা, স্টার্নাম, কশেরুকা এবং হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকের অস্থিমজ্জা থেকে রক্তকণিকা তৈরি হয়। লোহিত অস্থিমজ্জার **হেমাটোপয়েটিক স্টেম কোষ** (hematopoietic stem cells, HSCs) সব ধরনের রক্ত কণিকা তৈরি করে। লোহিত মজ্জা থেকে প্রতিদিন ৫ বিলিয়ন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়।

৬. **চর্বির আধার :** হলুদ অস্থিমজ্জা সঞ্চিত চর্বির আধার হিসেবে কাজ করে।

৭. **খনিজ পদার্থের সঞ্চয় :** অস্থির মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় খনিজ লবণ জমা থেকে দেহের প্রয়োজনে অস্থি থেকে মুক্ত হয়ে রক্তে সরবরাহ করে। দেহের প্রায় ৯৭% ক্যালসিয়ামই অস্থিতে জমা থাকে।

৮. **শ্রবণ :** কঙ্কালতন্ত্রের সবচেয়ে ছোট অস্থি অন্তঃকর্ণের মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

৯. **রোগ প্রতিরোধ :** অস্থির **রেটিক্যুলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্র** (reticulo-endothelial system, RES) দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।

১০. **হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ :** অস্থিকোষ থেকে **অস্টিওক্যালসিন** (osteocalcin) হরমোন ক্ষরিত হয় যা রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ ও দেহে চর্বি সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করে।

তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি (Cartilage)

রক্তবাহিকাবিহীন, নমনীয়, মজবুত, অভঙ্গুর, স্থিতিস্থাপক গঠনবিশিষ্ট যোজক টিস্যুকে তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ বলে। মানুষের নাক, কান, হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তক, বিভিন্ন অস্থিসন্ধি, শ্বাসনালি, আন্তঃকশেরুকা চাকতি ইত্যাদিতে তরুণাস্থি থাকে।

তরুণাস্থির গঠন

১. প্রচুর পরিমাণ মাতৃকা (ম্যাট্রিক্স) ও স্বল্প সংখ্যক কোষ নিয়ে তরুণাস্থি গঠিত।

২. তরুণ অবস্থায় কোষগুলো **কন্ড্রোব্লাস্ট** (chondroblast) এবং পরিণত অবস্থায় **কন্ড্রোসাইট** (chondrcyte) নামে পরিচিত।

৩. ম্যাট্রিক্স অর্ধ-কঠিন এবং **কন্ড্রিন** (chondrin) নামে পরিচিত। কন্ড্রোমিউকয়েড ও কন্ড্রোঅ্যালবুমিনয়েড নামক দুপ্রকার প্রোটিন দিয়ে কন্ড্রিন গঠিত।

৪. ম্যাট্রিক্সে **ল্যাকুনা** (lacuna, বহুবচনে lacunae) নামক তরলে পূর্ণ ছোট ছোট অনেক গহ্বর থাকে। প্রত্যেক ল্যাকুনায় এক বা একাধিক কোষ দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে।

৫. ম্যাট্রিক্সে কিছু তন্তুও থাকে। তন্তুর মধ্যে **কোলাজেন** তন্তুই প্রধান।

৬. প্রত্যেক তরুণাস্থি **পেরিকন্ড্রিয়াম** (perichondrium) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত একটি পাতলা আবরণে আবৃত থাকে। DAT(23-24)

৭. আবরণী ও মাতৃকা ভেদ্য বলে তরুণাস্থি টিস্যুতে রক্তনালির প্রয়োজন হয় না। রক্তের বস্তুসমূহ ব্যাপনের (diffusion) মাধ্যমে কোষে প্রবেশে সক্ষম।

তরুণাস্থির কাজ

১. তরুণাস্থি বিভিন্ন অঙ্গের **চাপ ও টান প্রতিরোধ** করে।

২. এগুলো বিভিন্ন অঙ্গের **আকৃতি গঠন** করে।

৩. অস্থিসন্ধিতে এরা দুটি অস্থিকে সংযুক্ত হতে সহায়তা করে এবং অস্থির প্রান্তভাগকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

৪. **ফাইব্রোকার্টিলেজ** (fibrocartilage) দেহের সবচেয়ে শক্তিশালি ও দৃঢ় তরুণাস্থি। এগুলো টেনডন ও লিগামেন্টকে অস্থির সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করে।

৫. তরুণাস্থিতে **লুব্রিসিন** (lubricin) নামক **গ্লাইকোপ্রোটিন** থাকে যা কঙ্কালতন্ত্রে **জৈব লুব্রিকেটর** (organic lubricator) হিসেবে কাজ করে।

৬. তরুণাস্থি মেরুদণ্ডীদের ভ্রূণীয় কঙ্কাল ও কনড্রিকথিস জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে।

তরুণাস্থির প্রকারভেদ

মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে নিচে বর্ণিত চার ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায় :

উদাহরণ * *

১. স্বচ্ছ বা হায়ালিন (Hyaline) তরুণাস্থি : এর ম্যাট্রিক্স সামান্য স্বচ্ছ, নীলাভ, নমনীয় ও তন্তুবিহীন। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণীয় কঙ্কাল স্বচ্ছ তরুণাস্থি নির্মিত। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থি সন্ধিস্থল, পর্শুকার প্রান্তভাগ, নাসিকা, শ্বাসনালি, কর্ণকুহর ইত্যাদি স্থানে এধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

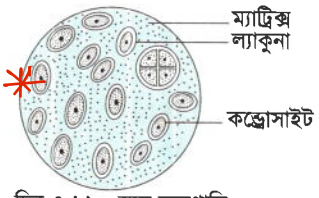

চিত্র ৭.১২ : স্বচ্ছ তরুণাস্থি

২. স্থিতিস্থাপক (Elastic) বা পীত-তন্তুময় (Yellow fibrous) তরুণাস্থি : এর ম্যাট্রিক্স অস্বচ্ছ ও হাল্কা হলুদ বর্ণের। ম্যাট্রিক্সে পীতাভ (হলদে) স্থিতিস্থাপক তন্তু জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকে। বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের তন্তুগুলো অপেক্ষাকৃত ঘনবিন্যস্ত। বহিঃকর্ণ বা পিনা, ইউস্টেশিয়ান নালি, এপিগ্লটিস প্রভৃতি অংশে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

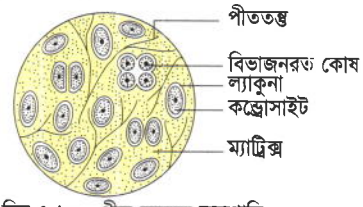

চিত্র ৭.১৩ : পীত-তন্তুময় তরুণাস্থি

DAT (18-19)

৩. শ্বেত-তন্তুময় (White fibrous) তরুণাস্থি : এর ম্যাট্রিক্সে প্রচুর সাদা বর্ণের, অশাখ, অস্থিতিস্থাপক, কোলাজেন নির্মিত তন্তু সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে। বিশেষ কয়েকটি সন্ধিতে, যেমন-দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অস্থির সাথে টেনডন বা লিগামেন্টের সংযোগস্থল প্রভৃতি স্থানে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

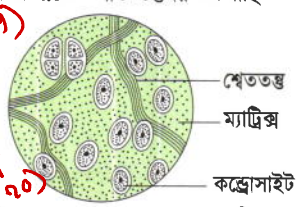

চিত্র ৭.১৪ : শ্বেত-তন্তুময় তরুণাস্থি

MAT (19-20)

৪. চুনময় বা ক্যালসিফাইড (Calcified) তরুণাস্থি : এ ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা থাকে, ফলে অনেকটা অস্থির মতো শক্ত রূপ ধারণ করে। হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

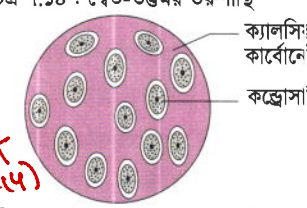

চিত্র ৭.১৫ : ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি

MAT (13-14)

তরুণাস্থি ও অস্থির মধ্যে পার্থক্য (Reading)

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	তরুণাস্থি (কোমলাস্থি)	অস্থি
১. অবস্থান	অস্থির সংযোগস্থলে, পর্শুকার শেষপ্রান্তে, নাসিকা, কর্ণছত্র, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে।	মানব অন্তঃকঙ্কালের অধিকাংশই অস্থি দিয়ে গঠিত।
২. গঠন	অকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন তন্তু ও কোষ নিয়ে গঠিত।	কঠিন, অনমনীয়, অস্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত।
৩. অস্থিমজ্জা	অস্থিমজ্জা থাকে না।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্থিমজ্জা থাকে।
৪. প্রকৃতি	স্থিতিস্থাপক।	অস্থিতিস্থাপক।
৫. ম্যাট্রিক্স (মাতৃকা)	ম্যাট্রিক্সে **কন্ড্রিন** নামক জৈব পদার্থ থাকে।	ম্যাটিক্সে জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্তু, মিউকো-পলিস্যাকারাইড এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি থাকে।
৬. কোষের গঠন	গোলাকার বা ডিম্বাকার।	মাকড়সার জালের মত।
৭. আবরণ	**পেরিকন্ড্রিয়াম** আবরণ দিয়ে আবৃত।	**পেরিঅস্টিয়াম** আবরণ দিয়ে আবৃত।
৮. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র	থাকে না।	উপস্থিত।
৯. কাজ	দেহের আকৃতি ও ঋজুতা দান; অস্থি গঠন; এবং অস্থির সংযোজক অংশকে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করায় সহায়তা দান।	দেহের কাঠামো গঠন; নির্দিষ্ট আকৃতি দান; ভারবহন; দেহযন্ত্রের সুরক্ষা; এবং রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা দান।

ব্যবহারিক অংশ

মানুষের বিভিন্ন অস্থি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

মানুষের করোটি (Skull)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটিকার অস্থি, মুখমন্ডলের অস্থি,কর্ণাস্থি ও হাইওয়েড অস্থির সমন্বয়ে করোটি গঠিত।

২. চোয়াল ও ইন্দ্রিয়কোটর (নাক, কান, চোখ) উপস্থিত।

৩. করোটির পিছনে ও নিচে একটি বড় ছিদ্রপথ বা **মহাবিবর** (foramen magnum) রয়েছে।

৪. করোটিকার অস্থিগুলো হচ্ছে– ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোরাল, স্ফেনয়েড ও এথময়েড।

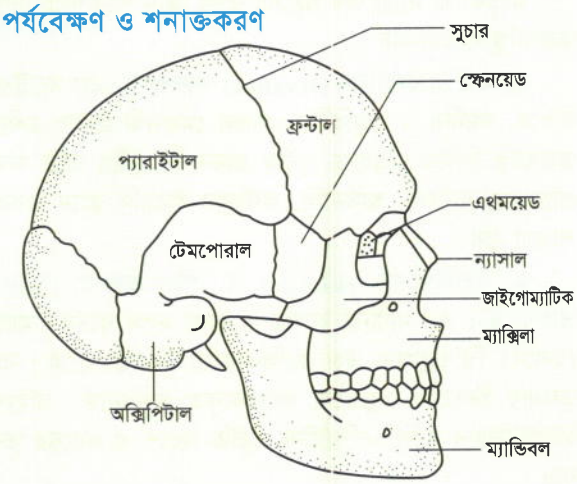

চিত্র ৭.১৬ : মানুষের করোটি

মানুষের ম্যান্ডিবল (নিম্নচোয়াল)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটির নিম্নচোয়াল গঠনকারী সবচেয়ে বড়, মজবুত ও বিজোড় অস্থি।

২. এটি একটি "U" আকৃতির **মূলদেহ** এবং দুটি চওড়া **র‍্যামি** (বহুবচন–rami; একবচন–ramus) নিয়ে গঠিত।

৩. মূলদেহ **বেস** ও **অ্যালভিওলার প্রসেস** নিয়ে গঠিত; অ্যালভিওলার প্রসেসে দাঁতের গোড়া প্রোথিত থাকে।

৪. প্রতিটি র‍্যামাস হাতলের মতো অংশ; এতে **করোনয়েড** ও **কন্ডাইলয়েড** নামে দুটি প্রবর্ধন এবং একটি ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র থাকে।

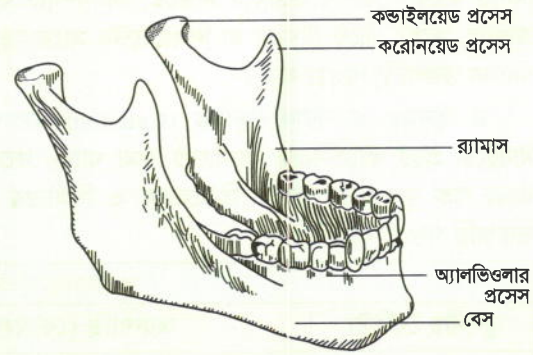

চিত্র ৭.১৭ : মানুষের ম্যান্ডিবল

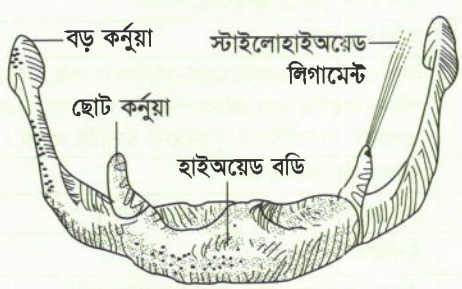

চিত্র ৭.১৮ : হাইঅয়েড অস্থি (সম্মুখদৃশ্য)

হাইওয়েড (Hyoid) অস্থি

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি "U" আকৃতির অস্থি।

২. অস্থির মাঝখানের অংশটি **হাইঅয়েড বডি**।

৩. বডি থেকে দুইজোড়া কাঁটা বা **কর্নুয়া** (cornua) বিস্তৃত।

৪. একজোড়া কর্নুয়া ছোট, এরা পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থান করে।

৫. অন্যজোড়া কর্নুয়া বড় এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থান করে।

অ্যাটলাস (Atlas) বা প্রথম সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. অস্থিটি দেখতে **আংটির মতো** ।
২. সেন্ট্রাম ও স্পাইনাস প্রসেস অনুপস্থিত ।
৩. **ভার্টিব্রাল ফোরামেন** (নিউরাল নালি) বেশ বড় ।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ বড় ও **ধমনি ছিদ্র** (ফোরামেন) যুক্ত ।
৫. একজোড়া **সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট** থাকে ।

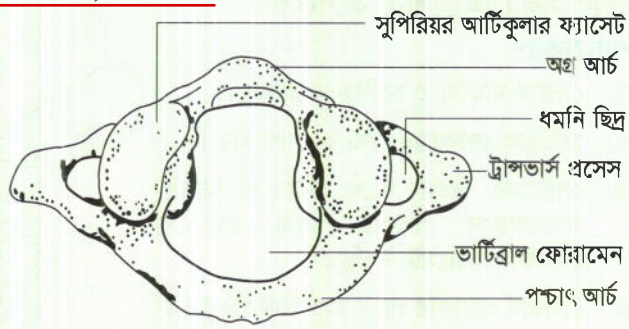

চিত্র ৭.১৯ : অ্যাটলাস

[ক্ষুদ্র ১ম কশেরুকা অনেক বড় করোটিকে বহন করে । দেবতা **অ্যাটলাস**-এর কাজের সাথে ১ম কশেরুকার "কাজের" সামঞ্জস্যের জন্য একে "অ্যাটলাস" বলে ।]

অ্যাক্সিস (Axis) বা ২য় সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রামের অগ্রপ্রান্তে লম্বা মোচা আকৃতির **ওডোন্টোয়েড প্রসেস** রয়েছে ।
২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার ।
৩. স্পাইনাস প্রসেস বড়, চওড়া ও শীর্ষ দ্বিখন্ডিত ।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেস খাটো ও ভোঁতা ।

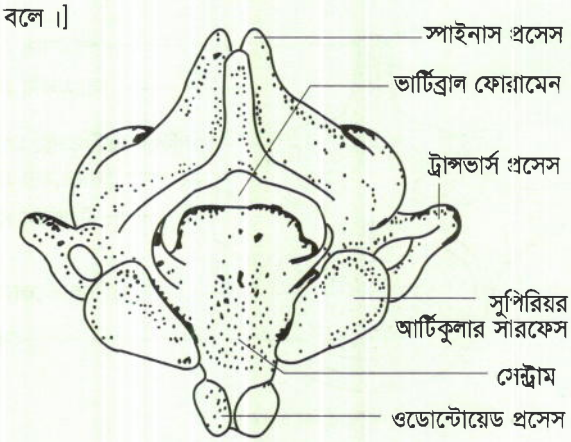

চিত্র ৭.২০ : অ্যাক্সিস

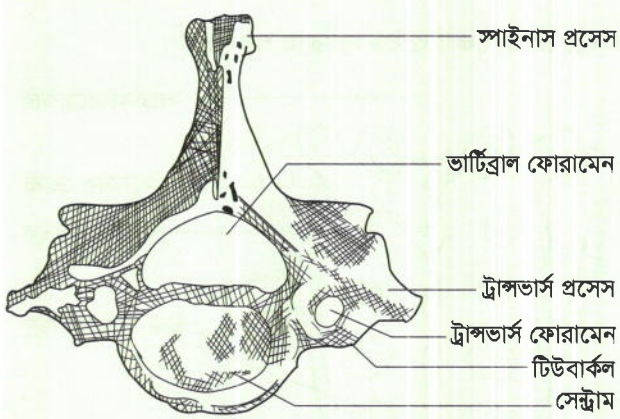

চিত্র ৭.২১ : ভার্টিব্রা প্রমিন্যান্স

ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স (Vertebra Prominens) বা ৭ম সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. স্পাইনাস প্রসেস অসাধারণভাবে দীর্ঘ ও অবিভক্ত ।
২. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ চওড়া ও ক্ষুদ্র **ট্রান্সভার্স ফোরামেন যুক্ত** ।
৩. ট্রান্সভার্স ফোরামেনের পশ্চাৎ অংশে সুস্পষ্ট **টিউবার্কল** থাকে ।

RMDAC

থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম মাঝারী ও হৃৎপিন্ড আকৃতির।

২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন ছোট ও গোলাকার।

৩. সেন্ট্রামের উভয় পাশে দেহ ও আর্চের সংযোগস্থলে পর্শুকার মস্তক সংযোগে **কোস্টাল ফ্যাসেট** উপস্থিত।

৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের প্রান্তে মসৃণ **টিউবারকুলার ফ্যাসেট** বিদ্যমান।

৫. স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সরু।

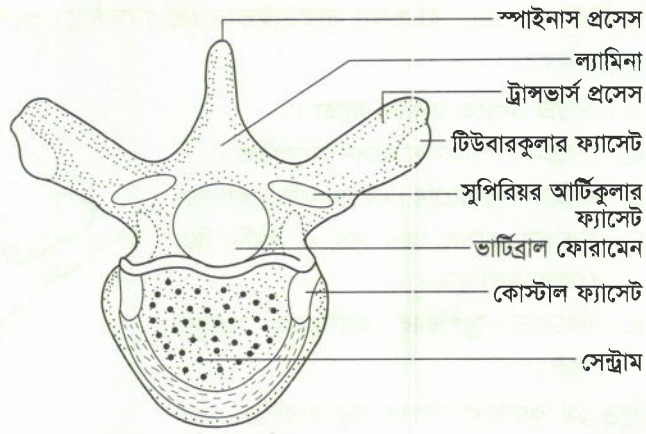

চিত্র ৭.২২ : থোরাসিক কশেরুকা

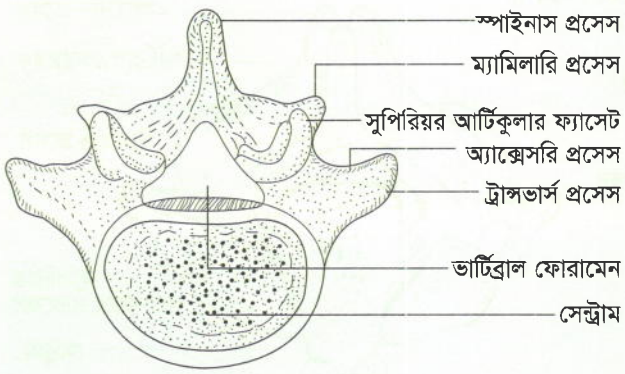

চিত্র ৭.২৩ : লাম্বার কশেরুকা

লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম বড়, মজবুত ও বৃক্ক আকৃতির।

২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।

৩. ট্রান্সভার্স প্রসেস লম্বা; ট্রান্সভার্স ফোরামেন নেই।

৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের পশ্চাৎ তলে **ম্যামিলারি ও অ্যাক্সেসরি প্রসেস** উপস্থিত।

৫. স্পাইনাস প্রসেস খাটো, মোটা ও চতুষ্কোণা।

স্যাক্রাম (Sacrum)

শনাক্তকরণ

১. শ্রোণি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের পাঁচটি কশেরুকা একীভূত হয়ে ত্রিকোণাকার ও বড় **স্যাক্রাম** গঠন করে।

২. সকল ভার্টিব্রাল ফোরামেন বা নিউরাল ছিদ্র মিলিতভাবে **স্যাক্রাল নালি** গঠন করে।

৩. সকল স্পাইনাস প্রসেস মিলিত হয়ে স্যাক্রামের পৃষ্ঠদেশে **স্যাক্রাল ক্রেস্ট** গঠন করে।

৪. পঞ্চম স্যাক্রাল কশেরুকায় একটি ডিম্বাকার ফ্যাসেট থাকে যার সাথে **কক্সিক্স** যুক্ত হয়।

৫. বেস (ভিত্তির) অগ্র-অঙ্কীয় ভাগে একটি **স্যাক্রাল প্রমোন্টরি** নামক প্রবর্ধন থাকে।

৬. স্যাক্রামের পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় দেশে ৪ জোড়া **স্যাক্রাল ছিদ্র** বিদ্যমান।

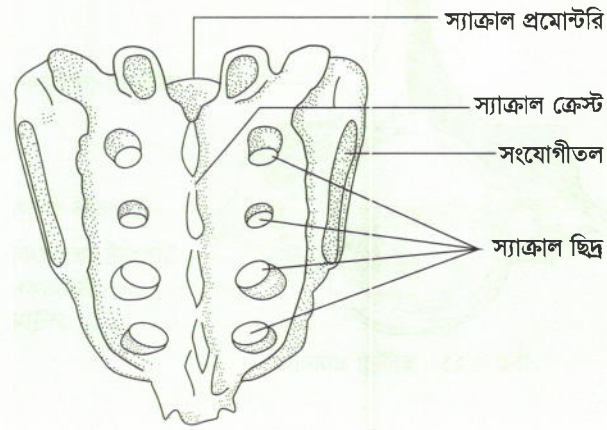

চিত্র ৭.২৪ : স্যাক্রাম

কক্কিক্স (Coccyx)

শনাক্তকরণ

১. ৩–৫টি ক্ষুদ্র কক্কিজিয়াল কশেরুকা একত্রে মিলিত হয়ে **কক্কিক্স** নামের ত্রিকোণাকার অস্থিপিন্ড গঠন করে।

২. এর ১ম কশেরুকা **মূলদেহ** গঠন করে।

৩. মূলদেহের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদিকে দুটি **আর্টিকুলেট কর্নু** থাকে। এর দুপাশে দুটি ক্ষয়প্রাপ্ত **ট্রান্সভার্স প্রসেস** বিদ্যমান।

৪. শেষ কক্কিজিয়াল কশেরুকা ক্ষুদ্র ও গোল **এপেক্স** গঠন করে।

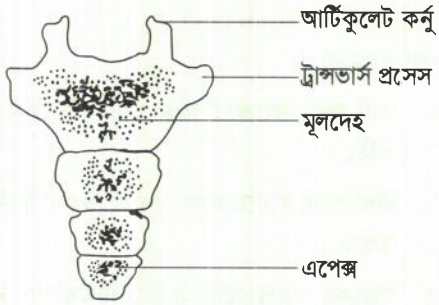

চিত্র ৭.২৫ : মানুষের কক্কিক্স

স্টার্নাম (Sternam) বা উরঃফলক

শনাক্তকরণ

১. বক্ষপিঞ্জরের অক্ষীয়দেশের মাঝখানে অবস্থিত লম্বা ও চাপা অস্থি।

২. উপরের দিকে ত্রিকোণাকার **ম্যানুব্রিয়াম**, মাঝের লম্বা আকৃতির **দেহ** বা **কর্পাস** ও শেষ প্রান্তের ছোট **জিফয়েড প্রসেস** নিয়ে এটি গঠিত।

৩. এর উপরের দিকে একটি **সুপ্রাস্টার্নাল নচ**, দুটি **ক্ল্যাভিকুলার নচ** ও দুপাশে ৭ জোড়া **পর্শুকা খাঁজ** থাকে।

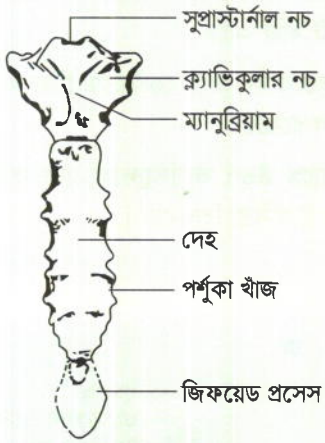

চিত্র ৭.২৬ : মানুষের স্টার্নাম

ক্ল্যাভিকল Clavicle বা Collar bone বা Beauty bone

শনাক্তকরণ

১. অস্থিটি লম্বা, সরু, "f" বা "s" আকৃতিবিশিষ্ট ও নিরেট।

২. ক্ল্যাভিকলের একপ্রান্ত গোলাকার **স্টার্নাল প্রান্ত** এবং অন্যপ্রান্ত চাপা **অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত**।

৩. স্টার্নাল প্রান্ত স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামের সাথে এবং অ্যাক্রোমিয়াল প্রান্ত অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস-এর সাথে যুক্ত থাকে।

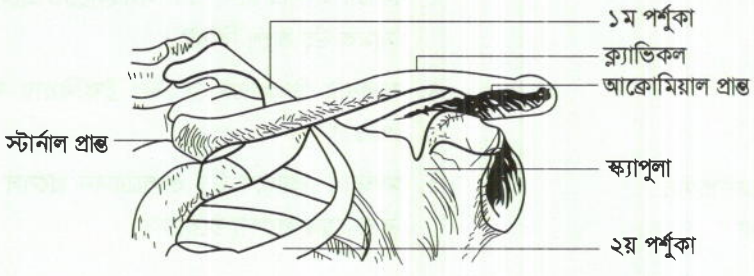

চিত্র ৭.২৭.ক : বক্ষ–অস্থিচক্রে ক্ল্যাভিকলের অবস্থান

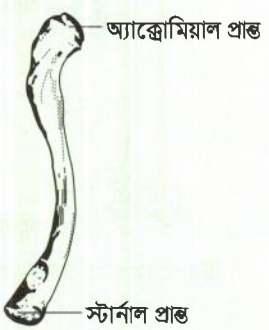

চিত্র ৭.২৭.খ : একটি ক্ল্যাভিকল

মানুষের অগ্রপদের অস্থি পর্যবেক্ষণ

হিউমেরাস (Humerus)

শনাক্তকরণ

১. এটি লম্বা, নলাকার অস্থি এবং দুটি প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

২. ঊর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল, তরুণাস্থি নির্মিত **মস্তক**।

৩. মস্তকের পাশে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** নামক স্ফীত অংশ আছে।

৪. মস্তকের ঠিক নিচে **অ্যানাটমিক গ্রীবা** নামে একটি খাঁজ আছে।

৫. মূলদেহের মধ্যভাগে **ডেল্টয়েড রিজ** নামক উঁচু অঞ্চল রয়েছে।

৬. নিম্নপ্রান্তে উত্তল **ক্যাপিচুলাম** এবং কপিকলের মতো **ট্রকলিয়া** বিদ্যমান।

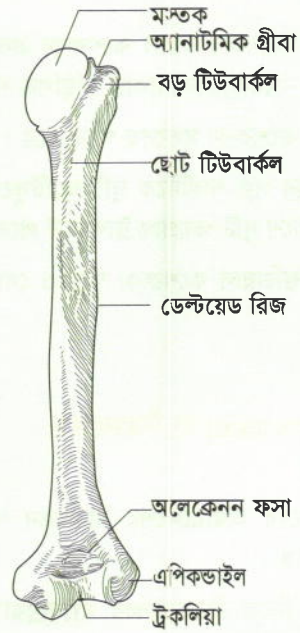

চিত্র ৭.২৮ : হিউমেরাস

চিত্র ৭.২৯ : রেডিয়াস-আলনা

রেডিয়াস-আলনা (Radius-Ulna)

শনাক্তকরণ

১. **রেডিয়াস** ও **আলনা** নামক পৃথক অথচ পরস্পরের সাথে দৃঢ়বদ্ধ দুটি অস্থি নিয়ে গঠিত।

২. রেডিয়াসের উপরে **মস্তক**-এর নিচে সংকুচিত **গ্রীবা** এবং একটু পরেই একটি উঁচু **টিউবারোসিটি** বিদ্যমান।

৩. নিচের অংশটি চাপা এবং **স্টাইলয়েড প্রসেস** নামক উঁচু অংশ বিশিষ্ট।

৪. আলনার ঊর্ধ্বপ্রান্তে অবতল **ট্রকলিয়ার নচ** পাওয়া যায়।

৩. আলনার অগ্রাংশে উঁচু **ওলেক্রেনন প্রসেস** ও **করনয়েড প্রসেস** রয়েছে।

মানুষের পশ্চাৎপদের অস্থি পর্যবেক্ষণ

ফিমার (Femur)

শনাক্তকরণ

১. শক্ত, নলাকার ও দেহের **বৃহত্তম অস্থি**।

২. ঊর্ধ্বপ্রান্তে **মস্তক**, গ্রীবা, বড় ও ছোট **ট্রোক্যান্টার** অবস্থিত।

৩. অস্থির পশ্চাৎতল অমসৃণ আলযুক্ত।

৪. নিম্নপ্রান্তটি প্রসারিত হয়ে দুটি **কন্ডাইল** (মিডিয়াল ও ল্যাটারাল) গঠন করে।

৫. দুই কন্ডাইলের মাঝখানে **আন্তঃকন্ডাইলার নচ** নামক গর্ত রয়েছে।

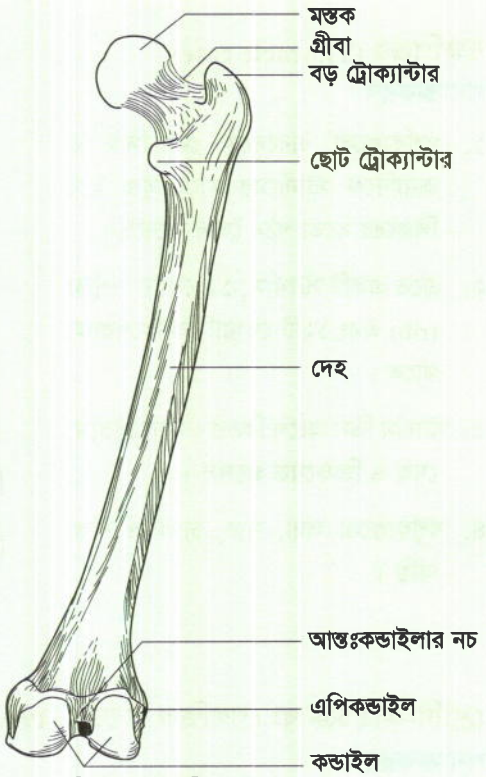

চিত্র ৭.৩০ : ফিমার

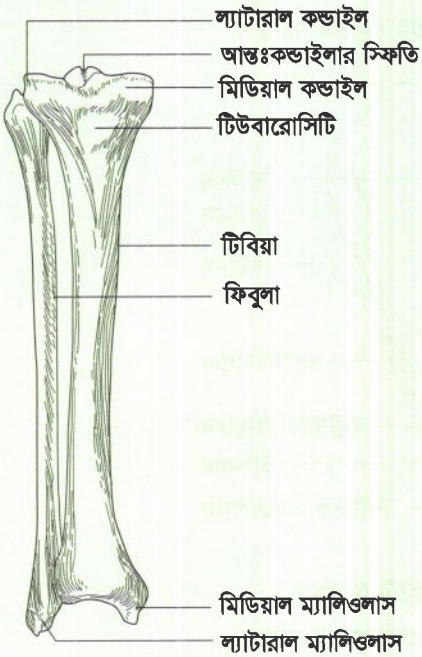

চিত্র ৭.৩১ : টিবিয়া–ফিবুলা

টিবিয়া-ফিবুলা (Tibia-Fibula)

শনাক্তকরণ

১. **টিবিয়া** ও **ফিবুলা** নামক পাশাপাশি অবস্থিত দুটি লম্বা অসম রডের মতো অস্থি।

২. **টিবিয়া** লম্বা, মোটা ও সুগঠিত।

৩. টিবিয়ার অগ্রপ্রান্তে **মিডিয়াল** ও **ল্যাটারাল কন্ডাইল, টিউবারোসিটি** এবং **নিম্নপ্রান্তে মিডিয়াল ম্যালিওলাস** নামক উঁচু অংশ আছে।

৪. **ফিবুলা** সরু এবং দীর্ঘ অস্থি; এর অগ্রপ্রান্তে একটি মস্তক ও নিম্ন প্রান্তে সূঁচালো একটি **ল্যাটারাল ম্যালিওলাস** থাকে।

বক্ষপিঞ্জর (Thoracic case)

শনাক্তকরণ

১. পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক ও অন্যদিকে স্টার্নামের সাথে যুক্ত হয়ে পিঞ্জরের মতো গঠন তৈরি করেছে।

২. এতে একটি **স্টার্নাম**, ১২ জোড়া **পর্শুকা** (rib) এবং ১২টি **থোরাসিক কশেরুকা** থাকে।

৩. স্টার্নাম তিন অংশে বিভক্ত– **ম্যানুব্রিয়াম, দেহ ও জিফয়েড প্রসেস**।

৪. পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি।

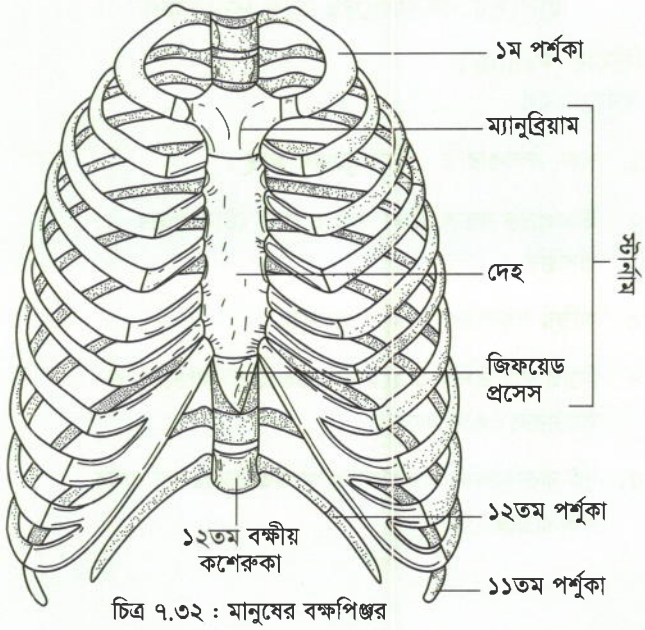

চিত্র ৭.৩২ : মানুষের বক্ষপিঞ্জর

শ্রোণি-অস্থিচক্র বা পেলভিক গার্ডেল (Pelvic girdle)

শনাক্তকরণ

১. দুটি সমান অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট অস্থি।

২. প্রত্যেক অর্ধাংশ **ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম** এবং **পিউবিস**-এ তিনটি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।

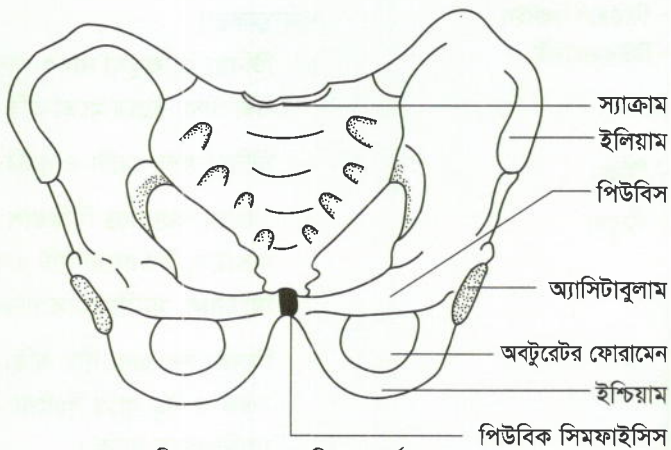

চিত্র ৭.৩৩ : পেলভিক গার্ডেল

৩. ইশ্চিয়ামের উপরের দিকে একটি কাঁটা ও নিচের দিকে **টিউবারোসিটি** উপস্থিত।

৪. ইলিয়াম ও পিউবিস দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি বড় ছিদ্র **অবটুরেটর ফোরামেন** রয়েছে।

৫. তিনটি অস্থির মিলনস্থলে একটি গভীর অবতল গহ্বর **অ্যাসিটাবুলাম** অবস্থিত।

পেশিটিস্যু–গঠন ও কাজ (Muscle Tissue–Structure and Function)

যে টিস্যু সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায় তাকে পেশিটিস্যু বলে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভ্রূণীয় **মেসোডার্ম** থেকে পেশিটিস্যু উৎপন্ন হয়। পেশিটিস্যুর একককে **পেশিকোষ** বা **পেশিতন্তু** বলা হয়।

পেশিটিস্যুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Features of Muscle Tissue)

১. পেশিটিস্যুর কোষগুলো লম্বা তন্তুর মতো হওয়ায় এগুলোকে **পেশিতন্তু**ও (muscle fibre) বলে।

২. পেশিকোষকে **মায়োসাইট** (myocyte) বলে যা **মায়োব্লাস্ট** (myoblast) নামক আদি-পেশিকোষ থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

৩. প্রত্যেক কোষ **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক ঝিল্লিতে আবৃত এবং এর ভিতরের সাইটোপ্লাজমকে **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm) বলে।

৪. কোষগুলো এক বা একাধিক সুস্পষ্ট **নিউক্লিয়াসযুক্ত**।

৫. পেশিকোষের সারকোপ্লাজমে **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক অসংখ্য সূক্ষ্ম উপতন্তু অনুদৈর্ঘ্যে পরস্পর সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে।

৬. মায়োফাইব্রিলগুলো **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myocin) নামক দুধরনের সঙ্কোচী প্রোটিনে নির্মিত। এগুলোকে একত্রে **সারকোমিয়ার** (sarcomeres) বলে এবং পেশিতন্তুর কার্যকর একক হিসেবে গণ্য করা হয়।

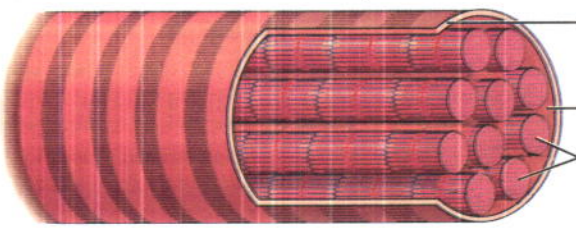

চিত্র ৭.৩৪ : পেশিতন্তু

৭. পেশিটিস্যুর আন্তঃকোষীয় পদার্থ বা **মাতৃকা** (matrix) খুব কম থাকে এবং আন্তঃকোষীয় ফাঁকগুলো নানা ধরনের টিস্যুতে পূর্ণ থাকে।

৮. পেশিতন্তুগুলো স্থিতিস্থাপক এবং **সঙ্কোচন-প্রসারণ** ক্ষমতা সম্পন্ন (অ্যাকটিন ও মায়োসিনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া অর্থাৎ অস্থায়ী সংযুক্তি ও বিযুক্তির ফলে সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটে)।

৯. কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভ্রূণীয় **মেসোডার্ম** (mesoderm) থেকে পেশির উৎপত্তি হয় (যেমন-চোখের পিউপিল সঙ্কোচন-প্রসারণকারী পেশি, স্তনগ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থিতে অবস্থিত কিছু পেশি এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন হয়)।

১০. পেশিটিস্যু প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি ও অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন ধরনের কঠিন পদার্থে গঠিত।

পেশির সাধারণ ধর্ম (Common Properties of Muscle)

১. স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) : পেশিতে বল প্রয়োগ করলে তা বেড়ে যায় এবং বল সরিয়ে নিলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

২. উত্তেজিতা (Excitability) : উপযুক্ত উদ্দীপনায় পেশি উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

৩. পেশিটান (Tonicity) : বিশ্রামরত অবস্থায় কঙ্কালপেশি কিছুটা টানটান বা সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে। পেশিটান স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. অবসাদ (Fatigue) : একটি পেশিকে বারবার উদ্দীপিত করলে তার সঙ্কোচন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং একসময় তা সাময়িকভাবে লোপ পায়।

৫. পরিবাহিতা (Conductivity) : পেশির একটি স্থানে উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে তা সম্পূর্ণ পেশিতে এবং আশেপাশের পেশিতে ছড়িয়ে পড়ে।

৬. নিঃসাড়কাল (Refractory period) : পেশিতে একবার উদ্দীপনা প্রয়োগের অব্যবহিত পরে যে সামান্য সময়ের জন্য পেশি দ্বিতীয় উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, তাকে **নিঃসাড়কাল** বলে। যে পেশির নিঃসাড়কাল যত ছোট, সে পেশি তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

পেশির কাজ

১. **দেহের আকৃতি প্রদান :** কঙ্কাল সংলগ্ন থেকে পেশি দেহের আকৃতি প্রদান করে।

২. **অভ্যন্তরীণ গঠন তৈরি ও সুরক্ষা :** ভিসেরাল পেশি সিলোমিক প্রাচীর তৈরি ও দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।

৩. **রক্ত সঞ্চালন :** হৃৎপেশি রক্ত সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ :** পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে বিভিন্ন অঙ্গের সুষ্ঠু সঞ্চালন ঘটে।

৫. **শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তা :** পেশিটিস্যু সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে পরিপাক, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজে সহায়তা করে।

৬. **দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ :** কঙ্কালপেশির সমদৈর্ঘ্য সঙ্কোচন ও পেশিটান বজায় রেখে দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে।

পেশিটিস্যুর প্রকারভেদ (Types of Muscle Tissue)

অবস্থান, গঠন ও কাজের ভিত্তিতে পেশিটিস্যুকে নিচে বর্ণিত তিনভাগে ভাগ করা হয়

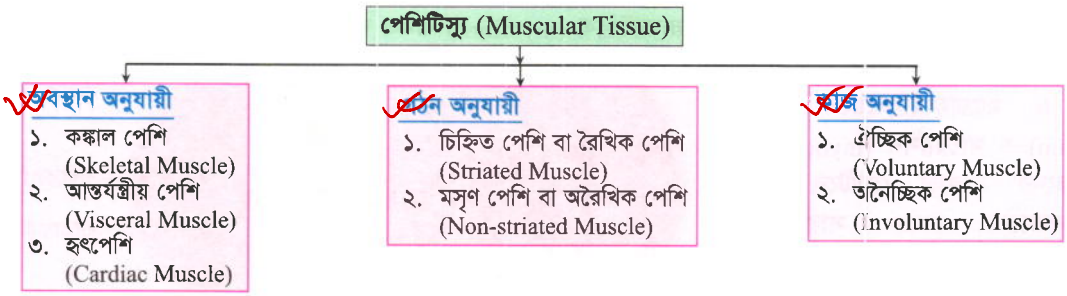

নিচে বিভিন্ন ধরনের পেশিটিস্যুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

১. অমসৃণ/রৈখিক/ঐচ্ছিক/কঙ্কাল পেশি (Nonsmooth/Striated/Voluntary/Skeletal Muscle)

যেসব পেশিটিস্যু রৈখিকভাবে বিন্যস্ত পেশিতন্তু দিয়ে গঠিত এবং প্রাণীর ইচ্ছেমতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহ সঞ্চালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর কঙ্কালের সাথে আটকে থাকে বলে এদের **কঙ্কালপেশিও** বলা হয়।

MAT(14-15)

অবস্থান : এ পেশি **টেন্ডন** নামক একপ্রকার তন্তুময় যোজক টিস্যু দিয়ে অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এছাড়া চক্ষু, চোয়াল, ঠোঁট, গলবিল, মধ্যচ্ছদা, পেট, ইন্টারকোস্টাল স্থান ইত্যাদিতেও এ পেশি অবস্থান করে।

গঠন : তন্তুর মতো দেখতে অসংখ্য পেশিকোষ দিয়ে কঙ্কালপেশি গঠিত। পেশিতে পেশিতন্তুগুলো **বান্ডল** (bundle) বা গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। পেশিতন্তুর প্রত্যেক গুচ্ছকে **ফ্যাসিকুলাস** (fasciculus, বহুবচনে fasciculi) বলে। গুচ্ছের প্রতিটি পেশিতন্তু স্বতন্ত্রভাবে **এন্ডোমাইসিয়াম** (endomycium) নামক যোজক টিস্যুর একটি পাতলা আবরণে এবং সম্পূর্ণ গুচ্ছটি **পেরিমাইসিয়াম** (perimycium) নামক যোজক টিস্যুর আরেকটি পুরু আবরণে আবৃত থাকে। অনেকগুলো ফ্যাসিকুলি একত্রিত হয়ে একটি বড় গুচ্ছ গঠন করে এবং তা **এপিমাইসিয়াম** (epimycium) নামক যোজক টিস্যুর আরেকটি পুরু ও সাধারণ আবরণে আবৃত থাকে। মূলত এপিমাইসিয়ামের আবরণে আবৃত পেশিতন্তুর একটি বড় গুচ্ছকেই বলে একটি **পেশি** বা **মাংস**।

প্রত্যেক পেশিকোষ সরু, নলাকার ও লম্বা। এরা দৈর্ঘ্যে ১ মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১০–৪০ মাইক্রোমিটার (μm)। প্রত্যেক পেশিকোষের নিজস্ব কোষঝিল্লি বা **সারকোলেমা** (sarcolemma) আছে এবং তা সুস্পষ্ট। কোষের সাইটোপ্লাজম বা **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm)- এ পরিধির দিকে অনেক (কয়েকশ) ডিম্বাকার **নিউক্লিয়াস** থাকে। কোষে অসংখ্য **মাইটোকন্ড্রিয়া** থাকে কারণ এসব কোষের প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এছাড়াও এদের সারকোপ্লাজমে কোষের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত ও সমান্তরালভাবে সজ্জিত অসংখ্য **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক অনুসূত্রক (অতিসূক্ষ্ম তন্তু) থাকে।

মায়োফাইব্রিল **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myocin) নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দিয়ে গঠিত। মায়োফাইব্রিলে অনুপ্রস্থ ও একান্তরভাবে সজ্জিত কতকগুলো স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ বা গাঢ় দাগ দেখা যায়। স্বচ্ছ দাগগুলো I (Isotropic) **ব্যান্ড** ও অস্বচ্ছ দাগগুলোকে A (Anisotropic) **ব্যান্ড** নামে চিহ্নিত করা হয়। অ্যাকটিন ও মায়োসিনের বিন্যাসের কারণেই মায়োফাইব্রিলে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ ডোরা সৃষ্টি হয়। এসব ডোরা বা দাগের কারণেই ঐচ্ছিক পেশিকে **অমসৃণ** বা **রৈখিক পেশি** বলা হয়।

চিত্র ৭.৩৫ : (ক) অস্থি ও পেশি; (খ) দুটি কঙ্কালপেশি; (গ) একটি মায়োফাইব্রিল

ধর্ম : (i) সঙ্কোচন–প্রসারণ ক্ষমতা খুব দ্রুত ও শক্তিশালী; (ii) সঙ্কোচন-প্রসারণ স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবদ্ধ নয়; (iii) নিঃসাড়কাল স্বল্পস্থায়ী বা ছোট; এবং (iv) সহজেই অবসাদগ্রস্থ হয়।

কঙ্কালপেশির কাজ : মানবদেহে বিদ্যমান ৬৫৬টি কঙ্কাল বা ঐচ্ছিকপেশি সমন্বিতভাবে নিচে বর্ণিত প্রধান কাজগুলো সম্পন্ন করে।

i. ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে ও চলনে** সহায়তা করে।
ii. অস্থির সাথে সংযুক্ত থেকে দেহের **আকৃতি দান** করে, দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে এবং **অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সুরক্ষিত** রাখে।
iii. এরা দেহের **তাপ নিয়ন্ত্রণ** করে।
iv. উত্তেজনায় উদ্দীপিত হয়ে **প্রতিবর্তী ক্রিয়ায়** সহায়তা করে।

কঙ্কালপেশির প্রকারভেদ : কাজের ভিত্তিতে কঙ্কাল বা ঐচ্ছিকপেশি বিভিন্ন ধরনের হয়।

- **ফ্লেক্সর পেশি** (Flexor muscle) : এ পেশি দেহের কোন অংশকে অপর কোন অংশের উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। যেমন– **বাইসেপস** (biceps) পুরোবাহুকে (fore arm) ঊর্ধ্ব বাহুর (upper arm) উপর ভাঁজ হতে সহযোগিতা করে।
- **এক্সটেনসর পেশি** (Extensor muscle) : এ পেশি ভাঁজ করা অংশকে পুনরায় সোজা হতে সহায়তা করে। যেমন– **ট্রাইসেপস** (triceps) ভাঁজ করা পুরোবাহুকে সোজা হতে সাহায্য করে।
- **অ্যাবডাকটর পেশি** (Abductor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে দেহের অক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে সাহায্য করে। যেমন : **ডেলটয়েড** (deltoid) হাতকে সামনে প্রসারিত করতে সহায়তা করে থাকে।
- **অ্যাডাক্টর পেশি** (Adductor muscle) :এ পেশি দেহের কোনো অংশকে দেহ অক্ষের কাছে আনতে সাহায্য করে। যেমন– **লাটিসিমাস ডরসি** (latissimus dorsi) হাতকে দেহ অক্ষের নিকটে নিয়ে আসে।
- **ডিপ্রেসর পেশি** (Depressor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে নিচে নামাতে অংশ নেয়; যেমন **ডিপ্রেসর ম্যান্ডিবুলি** (depressor mandibulae) নিম্নচোয়ালকে নিচের দিকে নামাতে সাহায্য করে; ফলে মুখ খুলতে পারে।

(DAT 23-24)

- **লিভেটর পেশি** (Levator muscle) : এটি দেহের কোনো অংশকে উপরে উঠতে সহায়তা করে; যেমন- **ম্যাসেটার পেশি** (masseter muscle) নিম্নচোয়ালকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে; ফলে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
- **রোটেটর পেশি** (Rotator muscle) : এটি দেহের কোন অংশের আবর্তনে সহায়তা করে। যেমন- **পাইরিফরমিস পেশি** (piriformes muscle) ফিমারকে ঘূর্ণনে সহযোগীর কাজ করে।

২. অনৈচ্ছিক/মসৃণ/অরৈখিক/ভিসেরাল পেশি (Involuntary/Smooth/Non striated/ Visceral Muscle)

যেসব পেশিটিস্যুর সঙ্কোচন-প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্নায়ু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে অনৈচ্ছিক পেশি বলে। এদের মায়োফাইব্রিলে কোন অনুপ্রস্থ রেখা থাকে না বলে এদেরকে **অরৈখিক** বা **মসৃণ পেশি** বলে। ভিসেরাল বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের প্রাচীরে থাকায় এ পেশিকে **ভিসেরাল পেশি**-ও বলা হয়।

অবস্থান : মানুষের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গ (visceral organs), যেমন– পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, শ্বাসনালি, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের প্রাচীরে এ পেশি পাওয়া যায়।

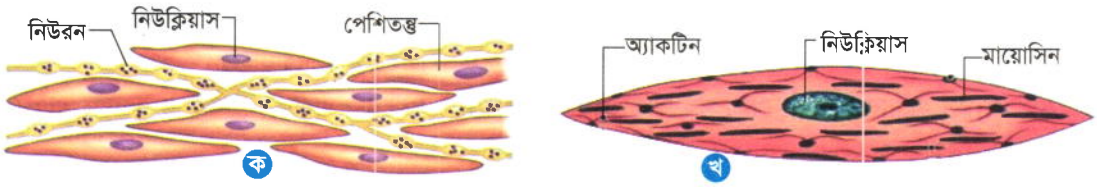

চিত্র ৭.৩৬ : (ক) একগুচ্ছ মসৃণপেশি; (খ) একটি পেশিতন্তু

গঠন : মাকু আকৃতির অসংখ্য কোষ নিয়ে অনৈচ্ছিক পেশি গঠিত। কোষগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দৈর্ঘ্যে ১৫–২০০ মাইক্রোমিটার। কোষগুলোর মধ্যভাগ চওড়া ও দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু। চওড়া অংশের ব্যাস ৮–১০ মাইক্রোমিটার। কোষের চওড়া অংশের মাঝখানে একটি ডিম্বাকার **নিউক্লিয়াস** থাকে। কোষঝিল্লি বা **সারকোলেমা** অস্পষ্ট। কোষের সারকোপ্লাজমে লম্বালম্বিভাবে অসংখ্য **মায়োফাইব্রিল** বিন্যস্ত থাকে। তবে মায়োফাইব্রিলগুলো সুগঠিত নয় এবং এতে কোনো অনুপ্রস্থ রেখা বা ব্যান্ড দেখা যায় না। পেশিতে একটি কোষের চওড়া অংশ অন্য কোষের সরু অংশের সাথে যুক্ত হয়ে ঘনভাবে গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে।

ধর্ম: (i) সঙ্কোচন–প্রসারণ ক্ষমতা মন্থর ও দীর্ঘস্থায়ী; (ii) সংঙ্কোচন-প্রসারণ স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবদ্ধ; (iii) নিঃসাড়কাল দীর্ঘস্থায়ী বা বেশি; এবং (iv) সহজে ক্লান্ত হয় না।

কাজ : (i) অনৈচ্ছিক পেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা ধীর। এগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ছন্দবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। (ii) পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তনালির অবিরাম সঙ্কোচন-প্রসারণ, শ্বাসনালির ও রেচননালির নিয়ম মাফিক সঙ্কোচন-প্রসারণ ইত্যাদি অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac Muscle)

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠনকারী বিশেষ ধরনের রৈখিক অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃৎপেশি বলে। এটি গঠনগতভাবে অনেকটা রৈখিকপেশির মতো, কিন্তু কার্যগতভাবে প্রায় অনৈচ্ছিক।

অবস্থান : হৃৎপিন্ডের মধ্যবর্তীস্তর মায়োকার্ডিয়ামে হৃৎপেশি অবস্থান করে। এর বাইরের দিকে **এপিকার্ডিয়াম** এবং ভিতরের দিকে **এন্ডোকার্ডিয়াম** নামক যোজক টিস্যুর আবরণ থাকে।

গঠন : অসংখ্য নলাকার পেশিতন্তু নিয়ে এ পেশি গঠিত। কোষগুলো দৈর্ঘ্যে ১০০–১৫০ মাইক্রোমিটার ও প্রস্থে ১২–১৫ মাইক্রোমিটার। প্রতিটি কোষ **সারকোলেমা** নামক সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে আবৃত এবং কোষের মাঝখানে একটি ডিম্বাকার

নিউক্লিয়াস থাকে। সারকোপ্লাজমে সমান্তরালে সজ্জিত **মায়োফাইব্রিল** নামের সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। মায়োফাইব্রিলের গায়ে **অনুপ্রস্থ রেখা** দেখা যায়। পেশিকোষগুলো **শাখাতন্তু** দিয়ে পরস্পর অনিয়মিতভাবে যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন তৈরি করে। দুটি কোষের সংযোগস্থলে সারকোলেমা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে অনুপ্রস্থভাবে পুরু চাকতির মতো গঠন করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) বলে। এর মাধ্যমে হৃৎস্পন্দনের সংকেতগুলো প্রবাহিত হয় এবং এটি হৃৎপেশির অন্যতম শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। প্রতি কোষের সারকোপ্লাজমে প্রায় ৫০০০ **মাইটোকন্ড্রিয়ার** উপস্থিতি দেখা যায়।

চিত্র ৭.৩৭ : হৃৎপেশি

ধর্ম: (i) সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা পরিমিতভাবে দ্রুত, (ii) সঙ্কোচন-প্রসারণ স্বতঃস্ফূর্ত ও ছন্দবদ্ধ; (iii) নিঃসাড়কাল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বা বেশি; (iv) সহজে ক্লান্ত হয় না।

কাজ : হৃৎপেশির অবিরাম সঙ্কোচন-প্রসারণ হৃৎপিন্ডে ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণ সৃষ্টি করে। এতে অবিরাম হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে মানবদেহে অবিচ্ছিন্ন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের পেশিটিস্যুর মধ্যে তুলনামূলক সারণী

আলোচনার বিষয়	রৈখিক পেশি বা ঐচ্ছিক পেশি	মসৃণ পেশি বা অনৈচ্ছিক পেশি	হৃৎপেশি
১. পেশিতন্তুর গঠন	নলাকার	মাকু আকৃতির	শাখান্বিত
২. পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য	১ মিমি থেকে কয়েক সেমি	১৫–২০০ মাইক্রোমিটার	১০০–১৫০ মাইক্রোমিটার
৩. পেশিতন্তুর ব্যাস	১০–৪০ মাইক্রোমিটার	৮–১০ মাইক্রোমিটার (স্ফীত অংশ)	১২–১৫ মাইক্রোমিটার
৪. সারকোলেমা	স্পষ্ট	অস্পষ্ট	সূক্ষ্ম
৫. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা	কয়েকশ	একটি	একটি
৬. অণুপ্রস্থ রেখা	আছে	নেই	আছে
৭. নিউক্লিয়াসের অবস্থান	পরিধির দিকে	স্ফীত অংশে	কেন্দ্রে
৮. শাখা-প্রশাখা	শাখাবিহীন	শাখাবিহীন	শাখা-প্রশাখা যুক্ত
৯. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	থাকেনা	থাকেনা	থাকে
১০. প্রকৃতি	ঐচ্ছিক	অনৈচ্ছিক	অনৈচ্ছিক
১১. সঙ্কোচনের ক্ষমতা	দ্রুত ও শক্তিশালী	মন্থর ও দীর্ঘস্থায়ী	পরিমিতভাবে দ্রুত, ছন্দোময়
১২. অবস্থান	বিভিন্ন অস্থির সাথে, চক্ষু, চোয়াল, ঠোঁট, গলবিল, মধ্যচ্ছদা, ইন্টারকোস্টাল স্থান ইত্যাদি	পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, শ্বসননালি, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের প্রাচীরে	হৃৎপিণ্ডের মধ্যবর্তী স্তর মায়োকার্ডিয়ামে
১৩. কাজ	অঙ্গ সঞ্চালন ঘটানো	বিভিন্ন নালিতে বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা	হৃৎস্পন্দন ঘটানো
১৪. চিত্র		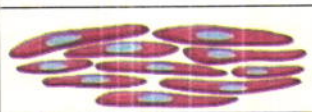	

DAT (17-18), (23-24)

পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না (Muscle can Pull but can not Push)

পেশি আমাদের চলন ও ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রণ করে, মানবদেহের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। পেশির ব্যবহার এক-দুদিনের নয়, নিত্যদিনের। প্রতিটি কাজ পেশিনির্ভর। আমরা জানি মানবদেহে ৩ ধরনের পেশি আছে। মসৃণপেশি, হৃৎপেশি ও রৈখিকপেশি। এগুলো সুসমন্বিত কাজের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

পেশি কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা প্রতিদিন কাজ করি। বাঁকা হই, টেবিল থেকে, মাটি থেকে কিছু তুলে নেই, আরও কতো কি। সবকিছুরই মূলে রয়েছে কিছু জোড়-পেশির জটিল কর্মকান্ড। যেমন-হাত ভাঁজ করা-সোজা করা বিষয়টি দেখতে যত সহজ সাবলীল মনে হয়, এর গূঢ়তত্ত্ব ঠিক ততোখানি কঠিন। এর মূল রহস্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলো সংকুচিত হয় ও টান দেয়, কিন্তু ধাক্কা দেয় না বরং প্রসারিত থাকে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমেই নিচের দুধরনের পেশি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

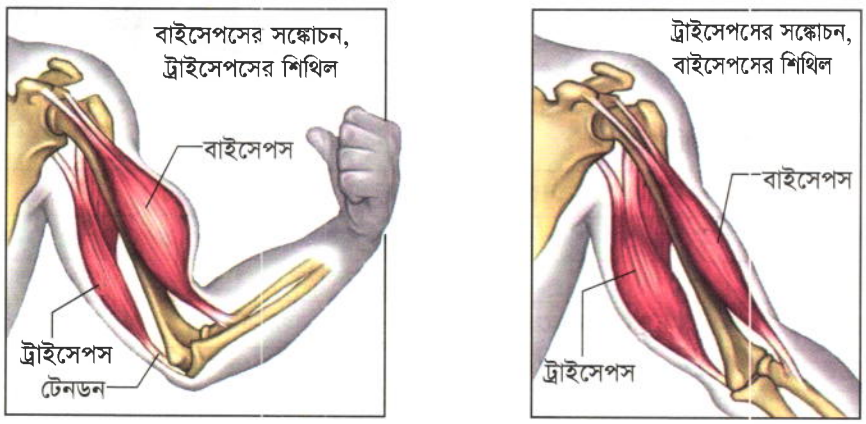

চিত্র ৭.৩৮ : উর্ধ্ববাহুর বাইসেপস ও ট্রাইসেপস পেশির অ্যান্টাগোনিষ্টিক কার্যাবলি

১. অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি (Antagonistic muscles)

দেহের অঙ্গ সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী জোড় কঙ্কালপেশি-দুটি পরস্পরের বিপরীতমুখী কাজ করে। এধরনের বিপরীতধর্মী কাজ সম্পাদনকারী পেশিদুটির একটিকে অপরটির **অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি** বলে। একই অঙ্গ পরিচালনাকারী এরকম দুটি পেশিকে **অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি-জোড়** (antagonistic muscles partner) বা **প্রতিপক্ষীয় পেশি-জোড়** বলে। এদের একটি যখন সংকুচিত হয় (contracts) অন্যটি তখন শিথিল (relax) হয় এবং বিপরীতক্রম (vice-versa) ঘটনা ঘটে। এদের সুশৃঙ্খল সমন্বয়ের মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সম্ভব হয়।

২. ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশি (Flexor and Extensor muscles)

যে পেশি কোনো অঙ্গকে অস্থিসন্ধিতে বাঁকিয়ে এনে ভাঁজ করে তখন তাকে **ফ্লেক্সর পেশি** বলে। এ পেশির বিপরীত কাজ সম্পাদনকারী পেশি (অর্থাৎ অ্যান্টিগোনিষ্টিক পেশি) যা ঐ অঙ্গকে সোজা করে বা প্রসারিত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয় তাকে **এক্সটেনসর পেশি** বলে। উর্ধ্ববাহুর হিউমেরাসের সাথে অবস্থানকারী **বাইসেপস** (biceps) ও **ট্রাইসেপস** (triceps) পেশি যথাক্রমে ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশির উদাহরণ।

ব্যাখ্যা

উর্ধ্ববাহুর **বাইসেপস** ও **ট্রাইসেপস** অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি-জোড়ের কার্যাবলি থেকে **"পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না"** এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখা যায়। হাতের সামনে অবস্থিত পেশিকে **বাইসেপস পেশি** বলে। এর একপ্রান্ত স্ক্যাপুলার সঙ্গে আটকানো এবং অন্যপ্রান্ত রেডিয়াস অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। বাইসেপস পেশি সঙ্কুচিত হলে কনুইসন্ধি

ভাঁজ হয়ে রেডিয়াস ও আলনা স্ক্যাপুলার দিকে উত্তোলিত হয়, ফলে হাত বাঁকানো সম্ভব হয়। এ প্রক্রিয়াকে **ফ্লেক্সন** (flexon) এবং পেশিকে **ফ্লেক্সর পেশি** বলে। বাইসেপস-এর অ্যান্টাগোনিষ্টিক পেশি হলো ট্রাইসেপস যা ঊর্ধ্ববাহুর হিউমেরাসের পিছন দিকে অবস্থিত। এর ঊর্ধ্বাংশ তিনটি টেনডন দিয়ে বক্ষ-অস্থিচক্রের স্ক্যাপুলা ও হিউমেরাসের পিছনে যুক্ত থাকে। এর নিম্নাংশ একটি টেনডন দিয়ে নিম্নবাহুর আলনা অস্থির অলিক্রেনন প্রসেসের সাথে যুক্ত থাকে। ট্রাইসেপস পেশির সঙ্কোচনে হাত আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এ পেশি কনুই সন্ধিকে প্রসারিত করে, তাই একে **এক্সটেনসর পেশি** বলে। ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশি একসঙ্গে পরস্পর বিরোধী কাজ করে অর্থাৎ বাইসেপস পেশি সঙ্কুচিত হলে ট্রাইসেপস শ্লথ হয় আবার ট্রাইসেপস সঙ্কুচিত হলে বাইসেপস শ্লথ হয়, ফলে হার বাঁকানো ও সোজা করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। এসব কারণে সঙ্কোচনের জন্য টান পড়লেও ধাক্কা লাগে না।

অ্যাকটিন ও **মায়োসিন** এ দুধরনের প্রোটিন থাকে বলে পেশি টানতে পারে। এসব প্রোটিন পেশিকোষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সংশিষ্ট পেশির প্রতিটি কোষ মস্তিষ্কের কোনো অংশ থেকে সঙ্কোচনের সংকেত পেলে মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে পৃথক বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাগুলোকে সমন্বিত করে 'টান' দেয়ার কাজটি সম্পন্ন করে। হাড়কে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে বিপরীতধর্মী পেশিও সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে অর্থাৎ টেনে সোজা করে দেয়। এ কারণেই বলা হয় যে, **পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না**।

ব্যবহারিক (Practical)

প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা পর্যবেক্ষণ।

পাশাপাশি দুটি অণুবীক্ষণযন্ত্রে একটিতে মসৃণ পেশির স্লাইড এবং অন্যটিতে হৃৎপেশির স্লাইড স্থাপন করে উভয় পেশি পর্যবেক্ষণ করে এগুলোর কাঠামোগত তুলনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

চিত্র ৭.৩৯ : মসৃণ পেশি (বায়ে) এবং হৃৎপেশি (ডানে)

মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা

তুলনীয় বিষয়	মসৃণ পেশি	হৃৎপেশি
১. আকার ও আকৃতি	পেশিতন্তুগুলো লম্বা ও মাকু আকৃতির এবং শাখাবিহীন।	পেশিতন্তুগুলো খাটো ও বেলনাকার এবং শাখাযুক্ত।
২. অনুপ্রস্থ রেখা	তন্তুতে অনুপ্রস্থ রেখা নেই।	অনুপ্রস্থ রেখা উপস্থিত।
৩. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	থাকে না।	কোষগুলোর সংযোগস্থলে থাকে।
৪. সারকোলেমা	পেশিকোষের আবরণ বা সারকোলেমা অস্পষ্ট।	সারকোলেমা সূক্ষ্ম।
৫. নিউক্লিয়াস	কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে।	কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে।
৬. মায়োফাইব্রিল	পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত।	পরস্পর অনিয়তভাবে যুক্ত হয়ে জালিকা গঠন করে।

কঙ্কালের কার্যক্রম এবং 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
(The Action of Skeleton and "Rods & Lever" System)

কঙ্কালিক পেশি আলাদাভাবে কাজ করতে পারে না। একটি পেশি যখন কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন সংযোগের স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় এর বল, গতি ও সঞ্চালনের মাত্রা কেমন হবে। এসব বৈশিষ্ট্য স্বাধীন এবং এদের সম্পর্ক নির্ভর করে পেশি ও কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ গঠনের উপর। নির্দিষ্ট একটি পেশির সংকোচনে যে বল, গতি ও সঞ্চালনের দিক প্রকাশ পায় তা বদলে দেয়া যাবে যদি ঐ পেশিকে একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া যায়। **লিভার** (lever) এমন একটি অনমনীয় **রড** (rod) যা সন্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি স্থায়ী পয়েন্ট বরাবর ঘুরতে সক্ষম। শিশুদের দোলায়মান বা টলায়মান দাঁড়ান বা হাঁটা লিভার ক্রিয়ার পরিচিত উদাহরণ। লিভারের মাধ্যমে (১) আরোপিত (applied) দিক, (২) আরোপিত বলের ফলে সৃষ্ট চলনের দূরত্ব ও গতি এবং (৩) আরোপিত বলের কার্যকর শক্তি (effective strength) পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পেশিটানের ক্রিয়া কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যেভাবে প্রকাশিত হয় তাতে কঙ্কালতন্ত্রে রড ও লিভার তন্ত্রের প্রভাব এবং আমাদের হাত-পাগুলোকে মেশিন ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় নেই। লিভারের প্রতি যে কোন বলপ্রয়োগকে বলে **প্রচেষ্টা** (effort)। যে বলপ্রয়োগে লিভারের চলন বাধাগ্রস্থ হয় (যেমন- দন্ডের উপর ওজনের কারণে নিম্নমূখি বল প্রয়োগ) তাকে বলে **ভার** (load) বা **প্রতিবন্ধক** (resistance)। পেশির সংকোচন হচ্ছে প্রচেষ্টা, আর এতে সংশ্লিষ্ট দেহের অংশটি হচ্ছে ভার বা বাধা। শরীরের হাড়গুলো লিভার (যান্ত্রিক কৌশল) হিসেবে কাজ করে, ফলে গতি বা শক্তির এক যান্ত্রিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ লিভারের ব্যবহারে একটি ক্ষুদ্র **বল** (force) বিরাট বল-এ পরিবর্তিত হতে পারে। পায়ের পেশির সামান্য সংকোচনের ফলে পায়ের শীর্ষে বৃহত্তর সঞ্চালন একটি ফুটবলকে সজোরে দূরে পাঠাতে সাহায্য করে। এটাই হচ্ছে যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage)।

লিভারের গঠন (Structure of Lever)

একটি লিভার ৪টি অংশ দিয়ে গঠিত :

১. **লিভার-বাহু** (Lever arms)- হাড়গুলো লিভার-বাহু হিসেবে কাজ করে;

২. **পিভট** (Pivot)- যে অস্থিসন্ধিকে কেন্দ্র করে লিভারের কাজ কর্ম পরিচালিত হয়;

৩. **প্রচেষ্টা** (Effort)- ভার সরানো বা নড়ানোর জন্য পেশি যে বল (force) সরবরাহ করে; এবং

৪. **ভার** (Load)- দেহের কোনো অংশের ওজন যা সরাতে হবে বা উঠাতে হবে কিংবা দেহের ভিতরে বা বাইরে নিতে হবে।

লিভারের প্রকারভেদ (Types of Lever)

পিভট, প্রচেষ্টা ও ভার-এর অবস্থানের ভিত্তিতে লিভার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. প্রথম-শ্রেণির লিভার (First-class lever) : এ ধরনের লিভারে পিভটটি ভার ও প্রচেষ্টার মাঝখানে অবস্থান করে। **কাঁচি** এ ধরনের লিভার, কিন্তু মানবদেহে প্রথম-শ্রেণি লিভার দুর্লভ। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, মাথা ও প্রথম কশেরুকার মধ্যবর্তী সন্ধিটি। এক্ষেত্রে মাথার খুলি হচ্ছে লিভার-বাহু; খুলি ও প্রথম কশেরুকা (অ্যাটলাস)-র মধ্যকার সন্ধিটি পিভট; মাথার পিছনে অবস্থিত পেশি থেকে আসা পেশল ক্রিয়া হচ্ছে প্রচেষ্টা; এবং ভার হচ্ছে মাথার ওজন যা প্রচেষ্টার কর্মকান্ডে উঁচু হয়ে থাকে (ওজনের বিরুদ্ধে)। পেশি (প্রচেষ্টা) শিথিল হলে মাথা ঝুঁকে পড়ে। এ লিভারের মাধ্যমে **অল্প বল প্রয়োগে বেশি ফল পাওয়া যায়**।

২. দ্বিতীয়-শ্রেণির লিভার (Second-class lever) : এ ধরনের লিভারে ভারের অবস্থান থাকে পিভট ও প্রচেষ্টার মাঝখানে। **ঠেলাগাড়ি** এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠেলাগাড়ির মেঝেয় যে মাল রাখা হয় সেটি ভার। এ অংশটি থাকে পিভটরূপী হুইল আর প্রচেষ্টারূপী ঠেলাচালকের হাতের মধ্যবর্তী স্থানে। পায়ের আঙ্গুলের ডগায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার সৃষ্টি হয়। তখন আঙ্গুলের সন্ধিগুলো হয় পিভট, দুপা লিভার-বাহু, কাফ-পেশি ও গোড়ালির টেন্ডন প্রচেষ্টা (যখন

কাফ পেশি সংকুচিত হয়) এবং দেহের ওজন হচ্ছে ভার (যা পেশি সংকোচনের ফলে উপরে উত্থিত হয়)। এ ধরনের লিভারের সাহায্যে **সামান্য প্রচেষ্টায় বেশি ওজনকে উপরে তুলে ধরা সহজ হয়**।

৩. তৃতীয়-শ্রেণির লিভার (Third-class lever) : এ ধরনের লিভারের প্রচেষ্টা থাকে পিভট ও ভার-এর মাঝখানে। উদাহরণ হিসেবে নখ কাটার যন্ত্রের (nail flipper) কথা উল্লেখ করা যায়। মানবদেহে তৃতীয়-শ্রেণির লিভারের সংখ্যা অনেক। একটি **ভাঁজ করা বাহুকে** তৃতীয়-শ্রেণির লিভার বলা যায়। এ ক্ষেত্রে কনুইয়ে রয়েছে পিভট (কনুই-সন্ধি), সম্মুখ বাহু হচ্ছে লিভার-বাহু, বাইসেপস পেশি প্রচেষ্টার যোগান দেয়, আর সম্মুখ বাহু কিংবা কোনো ওজনদার বস্তুসহ সম্মুখ

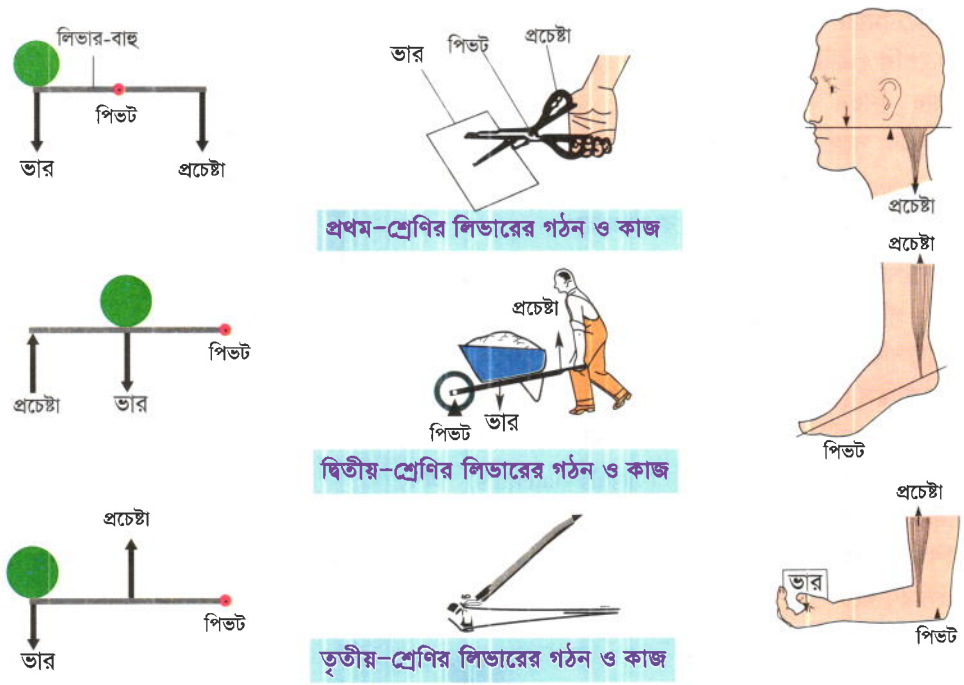

চিত্র ৭.৪০ : বিভিন্ন ধরনের লিভারের গঠন ও কাজ

বাহু হচ্ছে ভার। তৃতীয় শ্রেণির লিভারে প্রচেষ্টার অবস্থান ভার ও পিভটের মাঝে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা আর পিভট খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রচেষ্টার চেয়ে ভার বেশি হওয়ায় এ ক্ষেত্রে কোনো যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বাইসেপস পেশির সামান্য সংকোচনে সম্মুখ বাহুতে বৃহত্তর সঞ্চালনের সৃষ্টি হয় বলে যান্ত্রিক অসুবিধাটুকু পূরণ হয়ে যায়। **দ্রুতগতির সঞ্চালন** (movement) সুবিধা পাওয়া যায় এ ধরনের লিভার থেকে।

হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
(Coordination of Bones and Muscles in the Knee Movement)

মানুষের চলনে শুধু পেশি নয়, পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। কঙ্কালতন্ত্র দেহের অবয়বের কাঠামো। কাঠামোর উপরে আচ্ছাদন হিসেবে থাকে **পেশিতন্ত্র** (muscular system)। এ পেশি **ঐচ্ছিক** (voluntary) প্রকৃতির হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের কোনো উপাঙ্গকে যথেচ্ছ আন্দোলিত করতে পারে। **কন্ডরা** বা **টেন্ডন** (tendon) দিয়ে পেশি অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই কোনো অঙ্গকে যথেচ্ছ পরিচালনা করা বা স্থানান্তরে নেয়া **পেশি-কঙ্কালতন্ত্রের** (musculo-skeletal system) পারস্পরিক ছন্দবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। হাঁটুতে ৪টি অস্থি যুক্ত থাকে, যথা–একটি উরুর অস্থি **ফিমার**, দুটি জঙ্ঘাস্থি **টিবিয়া** ও **ফিবুলা** এবং একটি হাঁটুর টুপি **প্যাটেলা**। হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশি যেভাবে সমন্বয় সাধন করে তা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

MAT (14-15)

১. **বক্রীকরণ পেশি (Flexor) :** জানুসন্ধি (knee joint) পিছন দিকে বাঁকাতে দুটি পেশিগুচ্ছের প্রয়োজন হয়, এদের **হ্যামস্ট্রিং পেশি** (hamstring muscle) এবং **গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি** (gastrocnemius muscle) বলে। হ্যামস্ট্রিং পেশি তিনটি পেশি নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে **বাইসেপস ফিমোরিস** (biceps femoris), **সেমিমেম্ব্রেনোসাস** (semimembranosus) এবং **সেমিটেন্ডিনোসাস** (semitendinosus)। পেশিগুলো শ্রোণিচক্রের **ইশ্চিয়াম** (ischium) অংশে উৎপন্ন হয়ে ফিমারের পিছন দিয়ে **টিবিয়া** (tibia)-র উপরে যুক্ত হয়েছে। এদের সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে এবং হাঁটুসন্ধিতে ভাঁজ সৃষ্টি হয়।

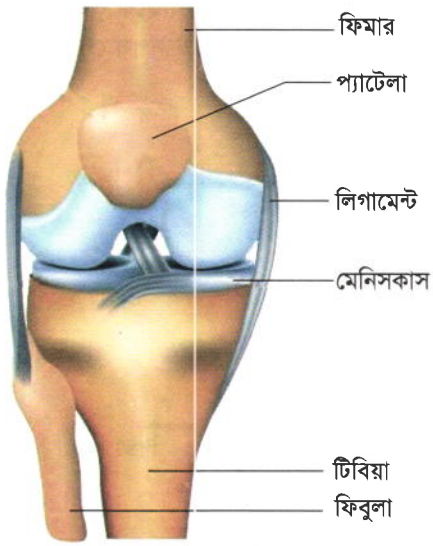

চিত্র ৭.৪১ : মানুষের হাঁটু

গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি টিবিয়ার পিছনে অবস্থিত পায়ের ডিম বা গুলির প্রধান পেশি। এটি **ফিমারের কনডাইল** (condyle) থেকে সৃষ্টি হয়ে টিবিয়ার পিছন দিয়ে গোড়ালিঅস্থি বা **ক্যালকেনিয়াস** (calcaneus)-এর সঙ্গে **অ্যাকিলিস কন্ডরা** (achilles tendon or calcanean tendon) দিয়ে যুক্ত হয়। এর সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া নিকটবর্তী হয়, ফলে হাঁটুসন্ধি পিছন দিকে ভাঁজ হয়।

৩. **প্রসারণ পেশি (Extensor) :** উরুর সামনে অবস্থিত চারটি পেশি নিয়ে গঠিত **কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস** (quadriceps femoris) হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটায়। এটি শ্রোণি থেকে উৎপন্ন **রেকটাস ফিমোরিস** (rectus femoris) এবং ফিমারের সামনে থেকে উৎপন্ন তিনটি ভ্যাসটি পেশি **ভ্যাসটাস মিডিয়ালিস** (vastus medialis), **ভ্যাসটাস ল্যাটারালিস** (vastus lateralis) এবং **ভ্যাসটাস ইন্টারমিডিয়াস** (vastus intermedius) নিয়ে গঠিত। এ তিনটি পেশি একসঙ্গে **প্যাটেলা** (patella)-র টেন্ডনের মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে যুক্ত হয়। এসব পেশির সঙ্কোচনে হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটে।

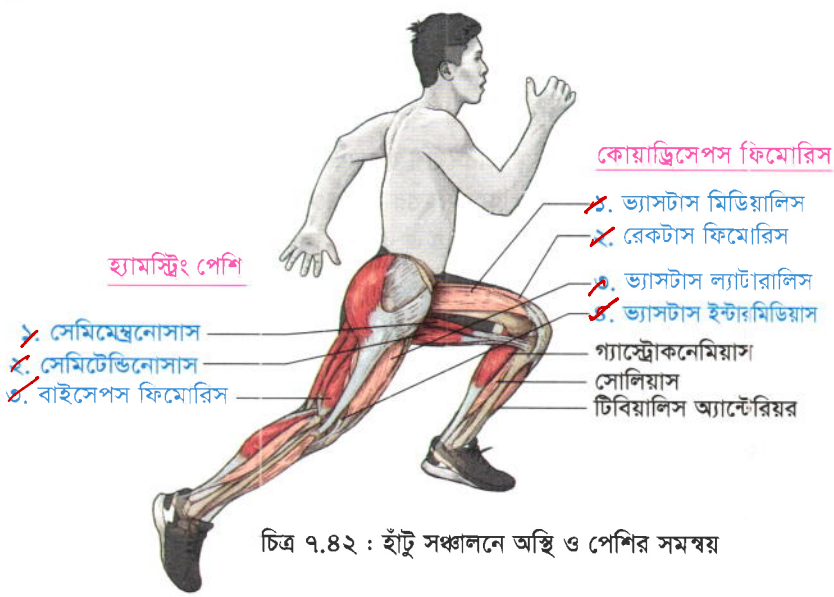

চিত্র ৭.৪২ : হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়

অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙ্গা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (Fracture of Bone and First Aid)

অস্থিভঙ্গ হচ্ছে এমন এক চিকিৎসাগত অবস্থা যেখানে রোগী অভিন্ন হাড়ের কোথাও ভেঙ্গে যাওয়াজনিত অসুস্থতায় ভোগে। প্রচন্ড শক্তি, চাপ কিংবা বিভিন্ন অসুখে (অস্টিওপোরোসিস, অস্থিক্যান্সার ইত্যাদি) ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ায় অস্থিভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

হাড় ভেঙ্গেছে কিনা তা কি করে বুঝা যাবে–

১. আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ নড়াবার চেষ্টা করলে খুব ব্যথা লাগে।
২. রোগী আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ একেবারেই নাড়াতে পারে না।
৩. আঘাতপ্রাপ্ত অংশে মৃদু চাপ দিলে বা হাত দিলে খুব ব্যথা অনুভব করে।
৪. যে স্থানে বেশি ব্যথা হয় সেই অঙ্গের আকারের পরিবর্তন দেখা যায়।
৫. রোগীর অচল অবস্থা এবং আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ফোলা ফোলা লাগে।

অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ (Types of Bone Fracture)

☐ যে রেখা বরাবর অস্থি ভাঙ্গে অথবা অস্থিটির অক্ষের সাথে ভাঙ্গা স্থানের সম্পর্কের ভিত্তিতে অস্থিভঙ্গকে নিচে বর্ণিতভাবে ভাগ করা যায়–

১. অনুপ্রস্থ অস্থিভঙ্গ (Transverse Fracture) : এতে কোনো অস্থি বা হাড় তার অক্ষের সমকোণ বরাবর ভাঙ্গে। অথাৎ অস্থিটি তার লম্ব অক্ষের সাথে আড়াআড়ি বা অনুপ্রস্থভাবে ভাঙ্গে। এরূপ ভাঙ্গা অস্থির ভাঙ্গা প্রান্তে গভীর দাঁতের মতো গঠন সৃষ্টি হয়, কিংবা অমসৃণ বা মসৃণ থাকতে পারে। বাঁকাভাবে কোনো চাপ অস্থির উপরে পড়লে এ রূপে হাড় ভাঙ্গতে দেখা যায়।

২. রৈখিক অস্থিভঙ্গ (Linear Fracture) : এক্ষেত্রে কোনো অস্থি বা হাড় তার লম্ব অক্ষ বরাবর ভাঙ্গে। কখনও খন্ড বিখন্ড হয়ে আলাদা হয় না। এতে লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর সরল বা সামান্য বাঁকানো ধরনের ভাঙ্গন দেখা যায়। অস্থির উপর লম্বালম্বিভাবে রৈখিক ধরনের চাপ সৃষ্টির কারণে এরূপে অস্থি ভাঙ্গতে পারে।

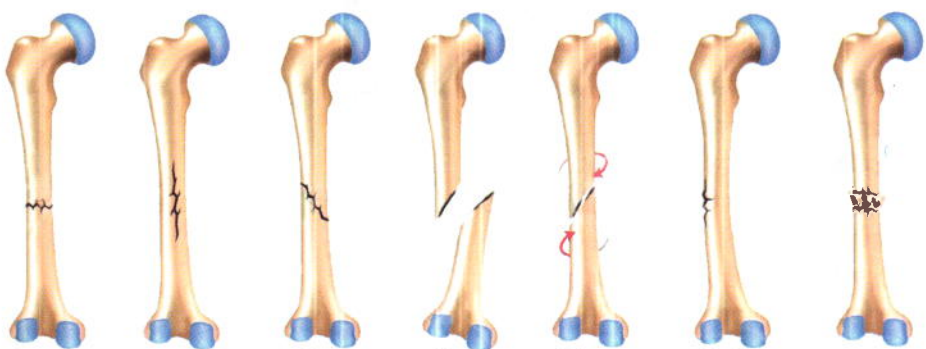

চিত্র ৭.৪৩ : বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ

৩. তির্যক অস্থিভঙ্গ (Oblique Fracture) : এতে একটি সরল, বাঁকানো বা ঢালু ধরনের ভাঙ্গন দেখা যায়। তির্যকভাবে বাঁকানো প্রকৃতির চাপজনিত কারণে এরূপে অস্থি ভাঙ্গতে দেখা যায়। খেলাধুলার সময় অথবা সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় পড়ে গেলে এভাবে অস্থি ভাঙ্গতে পারে। দেহের যে কোনো স্থানের অস্থিতে তবে সচরাচর হিউমেরাস, ফিমার, টিবিয়া, ফিবুলা এমনকি রেডিয়াস ও আলনার অস্থিকে এভাবে ভাঙ্গতে দেখা যায়।

৪. **সর্পিলাকার অস্থিভঙ্গ (Spiral Fracture) :** এরূপ অস্থি বা হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে অস্থিতে কর্কের স্ক্রুর অনুরূপ আকারের ভাঙ্গন দেখা যায়। অস্থির উপর মোড়ানো বা টুইস্টেড ধরনের চাপ সৃষ্টি হলে এভাবে অস্থি ভাঙ্গতে পারে। তাই এক্ষেত্রে সর্পিলাকার ভাঙ্গা অঞ্চল সৃষ্টি হয়। এ কারণে একে "Torsion Fracture" ও বলা হয়। সর্পিলাকার অস্থিভঙ্গ বা হাড় ভাঙ্গা খুব কমই দেখা যায়। দেহের কোনো অংশ, যেমন– পা, কোনো জায়গাতে আটকে গেলে, কিংবা মোচড়ে গেলে এরূপে হাড় ভাঙ্গতে পারে।

৫. **গ্রিনস্টিক ফ্রাকচার (Greenstick Fracture) :** এটি অসম্পূর্ণ অস্থি বিভাজন। এ ক্ষেত্রে অস্থির আংশিক বিভাজন ঘটে। ফলে অস্থির উপরের আচ্ছাদন অক্ষত থাকে। এতে হাড় বাঁকা হয় ও ফাটল ধরে কিন্তু ভেঙ্গে আলাদা হয় না। শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপ অস্থিভঙ্গ বেশি। কারণ শিশুদের অস্থি অপেক্ষাকৃত কোমল ও নমনীয় থাকে (বয়স্কদের তুলনায়)।

৬. **বহুখন্ডকিত অস্থিভঙ্গ (Comminuted Fracture) :** এক্ষেত্রে অস্থির একাধিক অঞ্চল বরাবর ভেঙ্গে অনেকগুলো খন্ড সৃষ্টি হয়। খন্ডগুলো বেশ নড়াচড়া করতে পারে এবং খন্ডগুলোর প্রান্ত বরাবর ঘষা লাগে। তাই প্রচন্ড ব্যথা সৃষ্টি হয়। বহু খণ্ডে পরিণত হয় বলে একে বহু খণ্ডকিত অস্থিভঙ্গ বা হাড় ভাঙ্গা বলা হয়।

❐ অস্থির ভাঙ্গার প্রকৃতি অথবা ত্বক ও পেশির সাথে ভাঙ্গার সম্পর্কের ভিত্তিতে অস্থিভঙ্গ নিম্নরূপ –

১. **উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ (Open Fracture) :** এ ধরনের অস্থিভঙ্গে ভাঙ্গা অস্থি পেশি ও ত্বক ছিঁড়ে বা ছিদ্র করে বাইরে বেরিয়ে আসে। এতে টিস্যুর পচন ঘটতে পারে, ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি অস্থির গভীরে সংক্রমণ ঘটবার ঝুঁকি থাকে।

২. **বদ্ধ অস্থিভঙ্গ (Closed Fracture) :** যখন কোনো অস্থিভঙ্গে ভাঙ্গা অস্থি অঙ্গের ভিতরেই থেকে যায়, ভাঙ্গা অংশ ত্বকের বাইরে আসে না, ত্বক ছিঁড়ে না এবং কোনো ক্ষত সৃষ্টি করে না তখন তাকে **বদ্ধ অস্থিভঙ্গ** বলে। এতে অস্থির গভীরেও সংক্রমণ ঘটবার কোনো ঝুঁকি থাকে না।

MAT (17-18)

❐ চিকিৎসা শাস্ত্র মতে অস্থিভঙ্গ প্রধানতঃ ৩ ধরনের। যথা– সাধারণ, যৌগিক ও জটিল।

ক. সাধারণ বা বদ্ধ ধরনের হাড়ভাঙ্গা (Simple or Closed Bone Fracture)

যে ধরনের অস্থিভঙ্গে ভঙ্গ অস্থি চামড়া বিদীর্ণ করে বের হয় না তাকে সাধারণ অস্থিভঙ্গ বলে। এ ধরনের অস্থিভঙ্গে হাড় শুধু দুই টুকরা হয়ে যায়, এর বেশি কিছু নয়। হাড় ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে না বলে এ ধরনের অস্থিভঙ্গের আরেক নাম **বদ্ধ অস্থিভঙ্গ** (closed fracture)।

সাধারণ অস্থিভঙ্গের লক্ষণ (Symptoms of Simple Fracture)

১. আঘাতপ্রাপ্ত স্থান সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যায়।
২. রক্ত জমে কাল শিরা পড়ে।
৩. আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ নড়াচড়া করতে ব্যথা লাগে এবং ভিতরে সূঁচ ফুটার মতো ব্যথা অনুভূত হয়।
৪. প্রচণ্ড ব্যথা হয়।
৫. সামান্য ভারী কোনো জিনিস তুলতে পারে না।
৬. হাত, পা অসাড় হয়ে যায়।
৭. হাত, পা বা সন্ধির আকার পরিবর্তন হয়।

চিত্র ৭.৪৪ : সাধারণ অস্থিভঙ্গ

প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

অস্থিভঙ্গের কারণে দেহকষ্ট যেন না বাড়ে সে জন্য দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন। এ চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি যেন আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় হাতও না দেয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হবে এবং দ্রুত যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে তা হচ্ছে–

১. অস্থিভঙ্গের মাত্রা ও সঠিক স্থান চিহ্নিত করতে হবে।
২. আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নড়াচড়া বন্ধ রাখতে হবে।
৩. সমস্ত ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে।

৪. রক্ত সঞ্চালনে বাধা হতে পারে এমন আঁটোসাঁটো জামা-কাপড়, গয়না-গাটি সরিয়ে ফেলতে হবে তা না হলে ভাঙ্গা হাড়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
৫. ভাঙ্গা হাড়ের জায়গায় রক্তপ্রবাহ, সঞ্চালন ও সংবেদন পরীক্ষা করতে হবে।
৬. ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য তার সঙ্গে কাঠের খন্ড বা বাঁশের চটি বেঁধে দিতে হবে।
৭. রক্ত প্রবাহ ও সঞ্চালন পুনর্বার পরীক্ষা করতে হবে।
৮. ভাঙ্গা হাড়ের জায়গাটি যেন ফুলে না উঠে সে জন্য আঘাত পাওয়া জায়গা ৬–১০ ইঞ্চি উঁচুতে রাখতে হবে।
৯. অস্থিভঙ্গের জায়গায় বরফ দেয়া যেতে পারে তবে দেখতে হবে জায়গাটি যেন ঠান্ডায় অসাড় না হয়ে যায়।
১০. "হঠাৎ ও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে" আহত ব্যক্তি যেন এমনটি মনে না করে সে জন্য তাকে চাঙ্গা রাখতে হবে এবং মাথা, ঘাড় ও শরীরের বিভিন্ন অংশ সাবধানে নড়াচড়া করতে হবে।
১১. মানসিক আঘাতে কাহিল না হলে রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। দ্রুত আঘাতপ্রাপ্তির স্থল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসক প্লাস্টার লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপত্র দেবেন। দেখা গেছে, সাধারণ অস্থিভঙ্গ ৮ সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়।

খ. যৌগিক বা উন্মুক্ত ধরনের হাড়ভাঙ্গা (Compound or Open Bone Fracture)

সাধারণত খেলাধূলার সময় কিংবা সড়ক দুর্ঘটনায় এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা ঘটে, তখন হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এটি বেশ জটিল হাড়ভাঙ্গা কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হয় এবং দ্রুত সংক্রমণ ঘটে। যৌগিক হাড়ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও সাধারণ হাড়ভাঙ্গার মতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে, তবে তা ক্ষণকালীন। কারণ যৌগিক হাড়ভাঙ্গা এত গুরুতর যা অস্ত্রোপচার ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা নেই।

চিত্র ৭.৪৫ : যৌগিক অস্থিভঙ্গ

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার প্রকারভেদ

হাড়ভাঙ্গার প্রকৃতির ভিত্তিতে যৌগিক হাড়ভাঙ্গাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

ধরন প্রথম : ক্ষতের পরিমাণ কম, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত দেখা যায় না এবং রক্তপাতও হয় কম।

ধরন দ্বিতীয় : ক্ষতের পরিমাণ বেশি, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত, টিস্যুর ক্ষতি দেখা যায় না এবং চামড়ারও তেমন ক্ষতি হয় না।

ধরন তৃতীয় : এক্ষেত্রে চামড়া, টিস্যু ও হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়। রক্তপাত, সংক্রমণ এড়াতে দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়।

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ

১. অস্থি ভেঙ্গে পেশি ও ত্বক ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে থাকা।
২. প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হওয়া।
৩. আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া।
৪. অজ্ঞান হয়ে পড়া।
৫. যন্ত্রণাময় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১. গরম সিদ্ধ পানি ও সাবান দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে।
২. ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে রক্তপড়া স্থান বেঁধে দিতে হবে। রক্ত পড়া বন্ধ হলে কাপড় বদলিয়ে ড্রেসিং করে দিতে হবে।

৩. রক্তক্ষরণ কমানোর জন্য আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ উঁচু করে রাখতে হবে।
৪. পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষত ঢেকে প্রেসার দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে।
৫. রোগীর ব্লাডপ্রেসার ও নাড়িস্পন্দন দেখতে হবে।
৬. ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথানাশক ওষুধ, যেমন- Tab. Aspirin বা Diclofenac ভরা পেটে দিতে হবে।
৭. দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব ক্লিনিক বা হাসপাতালে নিতে হবে, কারণ যৌগিক অস্থিভঙ্গ এত গুরুতর যাতে অস্ত্রোপচার ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা নেই।

গ. জটিল বা চাপা হাড়ভাঙ্গা (Complex or Compression Fracture)

জটিল হাড়ভাঙ্গার ফলে বেশ কয়েকটি হাড়, অস্থিসন্ধি, টেন্ডন ও লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌগিক হাড়ভাঙ্গার মতো এক্ষেত্রে হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে থাকে। জটিল হাড়ভাঙ্গাকে নানা ধরনে ভাগ করা যায়, এর মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে:

১. বহু-টুকরাবিশিষ্ট (Multifragmentary fracture) : এক্ষেত্রে হাড় অনেকগুলো ছোট টুকরায় পরিণত হয়।

২. কয়েক-টুকরাবিশিষ্ট (Comminuted fracture) : এধরনের জটিল হাড়ভাঙ্গায় হাড়ের টুকরাগুলো আগের ধরনের চেয়ে সামান্য বড় এবং সংখ্যায় কম থাকে।

জটিল হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ

১. ভাঙ্গা অস্থিখন্ডগুলোর পেশি ও ত্বক ভেদ করে বাইরে বের হয়ে থাকা।
২. অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।
৩. প্রচুর রক্তপাত হওয়া।
৪. ক্ষতস্থানে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া।
৫. যন্ত্রণাময় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১. রোগী যদি অজ্ঞান থাকে তবে রোগীর মুখ পরিষ্কার করে দিতে হবে, কাপড় ঠিলেঢালা করতে হবে যাতে সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয়।
২. রোগীর ব্লাডপ্রেসার ও নাড়িস্পন্দন ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে।
৩. যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে ক্লিনিক বা হাসপাতালে নিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ জটিল অস্থিভঙ্গ এতই গুরুতর যে অস্ত্রোপাচার ছাড়া এর বিকল্প নেই।

চিত্র ৭.৪৬ : জটিল অস্থিভঙ্গ

অস্থিসন্ধির আঘাত ও প্রাথমিক চিকিৎসা (Joint Trauma and First Aid)

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে **অস্থিসন্ধি** (joints of bones) বলে। অস্থিসন্ধি ৩ প্রকার। যথা–

১. তন্তুময় বা অনড় অস্থিসন্ধি : এধরনের অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থিদুটির প্রান্তদেশ শ্বেততন্তুময় টিস্যু (white fibrous tissue) দিয়ে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন থাকে, ফলে অস্থিগুলো অনড় প্রকৃতির হয়। করোটিতে এমন সন্ধি দেখা যায়।

২. তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি বা আংশিক সচল অস্থিসন্ধি : এ রকম অস্থিসন্ধিতে মিলিত অস্থিদুটির প্রান্তদেশ পরস্পরের সঙ্গে তরুণাস্থি দিয়ে সংলগ্ন থাকে। পিউবিক সিমফাইসিস (শ্রোণিচক্রের দুটি পিউবিক অস্থির সংযোগস্থল) এ ধরনের অস্থিসন্ধি।

৩. সাইনোভিয়াল বা সচল অস্থিসন্ধি : এ রকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থিদুটি একটি তরলপূর্ণ গহ্বর দিয়ে পৃথক থাকে। এ তরল সংযুক্ত অস্থিদুটিকে সংঘর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অস্থির প্রান্ত আর্টিকুলার তরুণাস্থি দিয়ে বেষ্টিত

থাকে। লিগামেন্ট অস্থিদুটিকে সংযুক্ত রাখে এবং টেনডন অস্থিদুটিকে পেশির সঙ্গে সংলগ্ন রাখে। এ ধরনের সন্ধি সচল প্রকৃতির। মানুষে অধিকাংশ অস্থিসন্ধি এ ধরনের। যেমন-কাঁধের সন্ধি, কনুই সন্ধি, হাঁটু সন্ধি, গোড়ালি সন্ধি, আঙ্গুলের সন্ধি ইত্যাদি।

দেহের সকল অস্থিসন্ধি অনন্য গড়ন ও সঞ্চালন ক্ষমতা নিয়ে মানবদেহকে সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা দান করে। হাত-পায়ের লম্বা অস্থিগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় বলে ক্ষতির ঝুঁকির মুখেও থাকে বেশি। আঘাতের লক্ষণের প্রকাশ ঘটে হালকা ব্যথা প্রকাশের মাধ্যমে। অস্থিসন্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হলে অস্থি, লিগামেন্ট ও অস্থিসন্ধির অন্যান্য টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতি তাৎক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী, হতে পারে দীর্ঘস্থায়ীও। এ বিষয়ে ধারণা অর্জনের জন্য নিচে **স্থানচ্যুতি** ও **মচকানো** সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. অস্থির স্থানচ্যুতি (Dislocation of Bone)

একটি অস্থিসন্ধিতে অবস্থিত দুটি অস্থির মধ্যে একটি সরে গেলে তাকে স্থানচ্যুতি বলে। সাধারণত প্রচন্ড আঘাতে হাড়ের স্থানচ্যুতি ঘটে। এর ফলে যে প্রচন্ড ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় তাতে মনে হতে পারে হাড় হয়তো ভেঙে গেছে। যে হাড়টি আঘাতে অস্থিসন্ধি বা সকেট থেকে সরে যায় জরুরী চিকিৎসা না করালে তার লিগামেন্ট ও স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। যে কোনো অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে।

স্থানচ্যুতি প্রধানত যে সব অস্থিসন্ধিতে ঘটে–

১. কাঁধের স্থানচ্যুতি : স্ক্যাপুলার গ্লেনয়েড গহ্বরের সাথে হিউমেরাসের অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি ঘটলে তাকে **কাঁধের স্থানচ্যুতি** বলে।

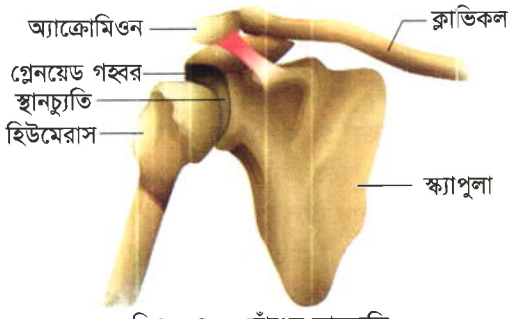

চিত্র ৭.৪৭ : কাঁধের স্থানচ্যুতি

২. হাটুর স্থানচ্যুতি: ফিমারের সাথে টিবিও-ফিবুলার অস্থিসন্ধি হাঁটুর অস্থিসন্ধি গঠন করে থাকে। এ অস্থিসন্ধির মধ্যে বিচ্যুতি ঘটলে তাকে **হাঁটুর অস্থির স্থানচ্যুতি** বলে।

৩. কোমরের স্থানচ্যুতি: ফিমারের মস্তক শ্রোণিচক্রের অ্যাসিটাবুলামের সাথে অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি ঘটলে তাকে **কোমরের অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি** বলা হয়।

এছাড়া কনুই, কব্জি, আঙ্গুল, নিম্নচোয়াল ইত্যাদি অঙ্গের সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।

কারণ

১. ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, হকি প্রভৃতি খেলাধূলাজনিত আঘাতের কারণে অস্থির স্থানচ্যুতি হতে পারে।

২. সড়ক বা যানবাহনের দুর্ঘটনায় প্রাপ্ত আঘাতজনিত কারণে অস্থির স্থানচ্যুতি হতে পারে।

৩. সিঁড়ি, ছাঁদ বা অন্য কোনো উচুঁস্থান থেকে পড়ে গিয়ে প্রাপ্ত আঘাতের কারণে অস্থির স্থানচ্যুতি হতে পারে।

৪. বাত ও অন্য কিছু রোগজনিত কারণে অস্থির স্থানচ্যুতি হতে পারে।

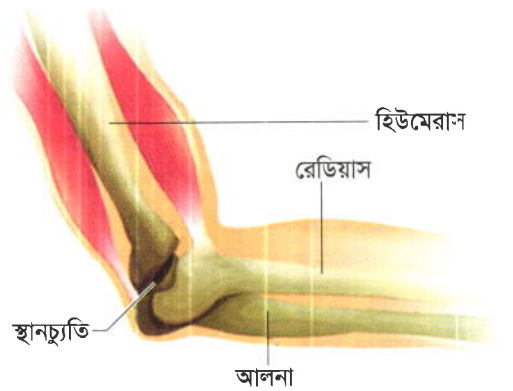

চিত্র ৭.৪৮ : কনুইনের স্থানচ্যুতি

প্রকারভেদ : অস্থির স্থানচ্যুতি প্রধানত চারধরনের, যথা–

১. জন্মগত অস্থিচ্যুতি (Congenital Dislocation) : শিশু জন্মের সময় অস্থিচ্যুতি নিয়ে ভূমিষ্ট হয়।

২. আঘাতজনিত অস্থিচ্যুতি (Traumatic Dislocation) : দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে আঘাত প্রাপ্ত হলে অস্থিচ্যুতি ঘটতে পারে।

৩. রোগজনিত অস্থিচ্যুতি (Pathological Dislocation) : কিছু রোগের কারণে অনেক সময় অস্থিচ্যুতি ঘটে।

৪. বাতজনিত অস্থিচ্যুতি (Paralytical Dislocation) : আর্থ্রাইটিস বা অন্য কোনো বাতব্যধির কারণে পেশি ভারসাম্য হারালে অস্থিচ্যুতি ঘটতে পারে। উরুসন্ধি ও হাটুসন্ধিতে এ ধরনের অস্থিচ্যুতি ঘটতে দেখা যায়।

লক্ষণ

১. স্থানচ্যুতির প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে– ঐ অস্থি তার কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে, নড়াচড়া করা যায় না।
২. স্থানচ্যুতি ঘটলে ঐ স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা ও রক্ত জমাট বেঁধে বিভিন্ন মাত্রার কাল শিরার সৃষ্টি হয়।
৩. স্থানচ্যুতির কারণে অস্থি, অস্থিসন্ধি থেকে সরে যাওয়ায় স্থানটি উঁচু হয়ে ফুলে থাকে।
৪. কাঁধ ও নিতম্বের স্থানচ্যুতি ঘটলে হাত ও পা নড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
৫. আঙ্গুলে স্থানচ্যুতি ঘটলে গোটা হাতই অকেজো হয়ে পড়ে।
৬. স্নায়ু অথবা রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে অস্থিসন্ধি সাময়িকভাবে অবশ হয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১. স্থানচ্যুত অস্থির নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
২. কোনো অবস্থাতেই নিজেরাই চাপাচাপি করে বিচ্যুত অস্থিকে আগের জায়গায় বসানোর চেষ্টা করা যাবে না। এতে অস্থিসন্ধির চারদিকের লিগামেন্ট, টেন্ডন পেশি ছিঁড়ে আরও খারাপ অবস্থা হতে পারে।
৩. কাঁধ, কনুইসন্ধি বা গোড়ালিতে স্থানচ্যুতি ঘটলে বিচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসানোর পর সেখানে চটি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে অস্থি আরও সরে না যায়।
৪. ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হলে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করতে হবে।
৫. ক্ষতস্থান ফুলে গেলে ফোলা কমানোর জন্য **আইস প্যাক** বা বরফ লাগাতে হবে।
৬. ব্যথা উপশমের জন্য ভরা পেটে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করানো যেতে পারে।
৭. দুর্ঘটনা যদি মারাত্মক হয় তবে যত দ্রুত সম্ভব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধ

দুর্ঘটনায় স্থানচ্যুতি হলে আঘাতের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। তবে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করলে স্থানচ্যুতির মতো যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। অতএব, খেলাধূলা, চলাফেরা বা যানবাহনে চলার সময় আগে থেকেই সর্তক থাকলে অনেক গুরুতর ক্ষতি এড়ানো যায়।

২. মচকানো (Sprains)

অস্থিসন্ধিতে আঘাত পেলে সন্ধিকে অবলম্বন দানকারী লিগামেন্টে সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টান কিংবা লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলে এমন অবস্থাকে **মচকানো** বলে। লিগামেন্ট হচ্ছে টিস্যু-নির্মিত স্থূল ব্যান্ড যা সন্ধিকে নির্দিষ্ট মুখি সঞ্চালনে অনুমতি দেয়। কিছু সন্ধি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে। এ কারণে লিগামেন্টের একাধিক গুচ্ছ অস্থিসন্ধিকে সঠিক বিন্যাসে ধরে রাখে। যখনই অস্থিসন্ধির একটি লিগামেন্টে অতিরিক্ত টান পড়ে বা ছিঁড়ে যায় তখনই মচকানো ঘটে। বলা যেতে পারে, মচকানোর প্রাথমিক ধাপে লিগামেন্টতন্তু সটান হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় ধাপে লিগামেন্টের কোনো অংশে চিড় ধরে; এবং শেষ ধাপে লিগামেন্ট সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়।

মচকানোর স্থান

মচকানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে গোড়ালিতে। দ্রুত ঘোরাতে বা মোচড়াতে গেলে গোড়ালির বাইরের ও পাশের অংশের লিগামেন্ট ছিঁড়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মচকায় গোড়ালি। সামান্য মচকানো সারিয়ে তোলা গেলেও গুরুতর মচকানোর কারণে অনেকের খেলোয়াড়ি জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। হাঁটুর ৪টি লিগামেন্ট কব্জাসন্ধির মতো কাজ করে। এগুলো সামনে-পিছনে-দুপাশে বিন্যস্ত হয়ে হাঁটুকে সচল ও সক্রিয় রাখে। কিন্তু হাঁটুর সামনের দিকে অবস্থিত **লিগামেন্ট** (anterior cruciate ligament, ACL) সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেলে সবচেয়ে বেশি

ক্ষতিকর মচকানো ঘটে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘাড় মচকানো রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে। গাড়ি হঠাৎ থমকে যাওয়াতে মাথার প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে এ মচকানোর সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে গ্রীবা কশেরুকাগুলোর ক্ষতি হয় না; বরং যে সব লিগামেন্ট কশেরুকাগুলো যথাস্থানে রাখতে সাহায্য করে সেগুলোর ক্ষতি হয়। একারণে প্রচন্ড ব্যথা ও ঘাড় ফুলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, কিন্তু কখনও ঘাড় বেশি বেঁকে গেলে সুষুম্না কান্ড (স্পাইনাল কর্ড) মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কব্জি মচকে যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। বেস বল, ফুটবল, বোলিং, স্কেইটবোর্ডিং, টেনিস প্রভৃতি খেলায় কব্জি মচকানো সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ বিপরীতমুখি উল্টে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুলসহ যে কোনো আঙ্গুল মচকে যেতে পারে।

চিত্র ৭.৪৮ : গোড়ালিতে মচকানো

মচকানোর লক্ষণ

১. মচকানোর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ব্যথা। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা অনুভবের বিষয়টি দেরিতেও হতে পারে।
২. সন্ধিতে আঘাত পাওয়ার কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জায়গাটি ফুলে যায়।
৩. লিগামেন্টতন্তু ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত হয়। কিছু সময় পর চামড়ার উপরে কালশিরা পড়ে।
৪. মচকানোর জায়গায় ব্যথা ও ফুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ঘিরে পেশি-আক্ষেপের সৃষ্টি হয় এবং পেশি শক্ত হয়ে যায়।
৫. ব্যথা, ফোলা ও পেশি-আক্ষেপ মিলে হাঁটা-চলাই দায় হয়ে পড়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

চিকিৎসা নির্ভর করে মচকানোর ধরণ ও ব্যাপকতার উপর। চিকিৎসকের পরামর্শে **নন-স্টেরয়ডাল** (non-steroidal) ওষুধ খাওয়া যেতে পারে ব্যথা কমানোর জন্যে। ভারী কিছু বহন করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। তবে প্রথমেই যা করতে হবে তা হচ্ছে মচকানো গুরুতর হলে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে হবে। গুরুতর মচকানোর ক্ষেত্রে বিশ্রাম নিতেই হবে এবং চারটি কাজ গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। এ ৪টি কাজের ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে **RICE** নাম দিয়ে প্রচলিত আছেঃ বিশ্রাম (Rest) + বরফ (Ice) + ক্ষত পরিষ্কার (Compression) + উচ্চতায় রাখা (Elevation) = **RICE.**

বিশ্রাম : মচকানো রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে। কোনো অতিরিক্ত চাপ দেয়া যাবে না। গোড়ালি মচকালে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে।

বরফ : মচকানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা ও ফোলা সীমিত রাখতে আক্রান্ত স্থানে কাপড়ে মোড়ানো বরফ দিতে হবে। এক নাগাড়ে দিনে ৩-৪ বার ১০-১৫ মিনিট করে বরফ লাগাতে হবে; এর বেশি সময় দিলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে।

ক্ষত পরিষ্কার : ক্ষত পরিষ্কার করে নতুন ব্যান্ডেজ এমনভাবে লাগিয়ে দিতে হবে যেন সন্ধিটি অনড় ও সঠিক অবলম্বনে থাকে। এ কাজটি অভিজ্ঞ নার্স দিয়ে করানো ভাল।

উচ্চতায় রাখা : মচকানো সন্ধিটি দেহের বাকি অংশের চেয়ে সামান্য উঁচুতে তুলে রাখতে হবে। এতে ফোলা কমে যাবে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত অস্থি ও তরুণাস্থি নামক যোজক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র মানবদেহের কাঠামো সৃষ্টি করে, নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি দান করে, দেহের ভার বহন করে, দেহের কোমল অঙ্গাদি সুরক্ষিত রাখে, পেশি সংযোগের উপযুক্ত স্থান সৃষ্টি করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে।

২. মানবদেহের সামগ্রিক পরিকাঠামো বা কঙ্কাল মোট ২০৬টি অস্থি সমন্বয়ে গঠিত। এটি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত : অক্ষীয় কঙ্কাল (৮০টি অস্থি) এবং উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (১২৬টি অস্থি)।

৩. অক্ষীয় কঙ্কাল দেহের মূল অক্ষ গঠন করে। এটি করোটি, মেরুদণ্ড, স্টার্নাম এবং পিঞ্জরাস্থি নিয়ে গঠিত।

৪. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল উপরের বক্ষ অস্থিচক্র ও উর্ধ্ববাহু এবং নিচের শ্রোণি অস্থিচক্র ও নিম্নবাহু নিয়ে গঠিত।

৫. জন্মের সময় শিশুর করোটিকার অস্থিগুলো আলাদা থাকে। ফলে মস্তকে ৬টি ফাঁকা স্থান থাকে। এদের ফন্টানেল বলে।

৬. যে যোজক টিস্যুর ম্যাট্রিক্সের (মাতৃকা) জৈব উপাদানের সাথে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জাতীয় অজৈব লবণ জমা হয়ে শক্ত, দৃঢ় ও ভঙ্গুর কাঠামো গঠন করে তাকে অস্থি বলে।

৭. অস্থিকোষ ও ম্যাট্রিক্স নিয়ে অস্থি গঠিত। ম্যাট্রিক্সে ৪ ধরনের অস্থিকোষ থাকে। যথা– অস্টিওপ্রোজেনিটর, অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট ও অস্টিওসাইট। প্রতিটি অস্থি পেরিঅস্টিয়াম নামক পাতলা মসৃণ আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। অস্থি ২ রকম– নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থি।

৮. নিরেট অস্থির মজ্জাগহ্বরকে ঘিরে অসংখ্য হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র বা অস্টিওন থাকে। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র অস্থির গাঠনিক ও কার্যকর একক। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র হ্যাভারসিয়ান নালি, ল্যামেলি, ল্যাকুনি, ক্যানালিকুলি, ম্যাট্রিক্স ও অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত।

৯. দেহের নমনীয়, মজবুত, অভঙ্গুর, স্থিতিস্থাপক গঠনবিশিষ্ট যোজক টিস্যুকে তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি বলে। তরুণাস্থির মাতৃকার নাম কনড্রিন।

১০. মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত যে টিস্যু অসংখ্য তন্তুর মতো কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায় তাকে পেশিটিস্যু বলে। পেশিটিস্যু তিন প্রকার– অনৈচ্ছিক বা মসৃণ, ঐচ্ছিক বা অমসৃণ বা কঙ্কালপেশি ও হৃৎপেশি।

১১. দৃঢ়, অস্থিতিস্থাপক ও উচ্চটান সহনশীল শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত গঠনকে টেনডন বা কন্ডরা বলে। এটি পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত করে।

১২. শক্ত কিন্তু স্থিতিস্থাপক তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত বন্ধনীকে লিগামেন্ট বলে। এটি একটি অস্থিকে অপর অস্থির সাথে যুক্ত করে।

১৩. যখন হাত, পা বা দেহের কোনো অংশ নড়াচড়া করে তখন যে সরল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অস্থি এবং পেশি আন্তঃক্রিয়া করে তাকে লিভার বলে। মানুষের কঙ্কাল ও পেশিতন্ত্রের কার্যক্রম এমনভাবে নকশা করা যা মানুষের চলন ও বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনে লিভারের মতো কাজ করে।

১৪. যখন ব্যাপক চাপে বা আঘাতের ফলে কিংবা রোগের কারণে দেহের কোনো অস্থি অখণ্ডতা হারায় তখন তাকে অস্থিভঙ্গ বলে। চিকিৎসকগণ একে FRX বা Fx সংকেত দিয়ে প্রকাশ করেন।

১৫. যখন কোনো আঘাত বা অন্য কোনো কারণে দেহের অস্থিসন্ধি গঠনকারী কোনো অস্থি সরে যায় তখন তাকে অস্থিসন্ধির স্থানচ্যুতি বা লাক্সেশন বলে।

১৬. অস্থিসন্ধিতে দুই বা ততোধিক অস্থি মজবুত, স্থিতিস্থাপক কতগুলো পেশিতন্তু দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। এদের লিগামেন্ট বা সন্ধিবন্ধনী বলে। কোনো কারণে অস্থিসন্ধির লিগামেন্ট আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাকে মচকানো বা স্প্রেইন বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হায়ালিন তরুণাস্থি পাওয়া যায়–
ক ফিমারের মস্তক খ ইউস্টেশিয়ান নালি
গ পিনা ঘ শ্বাসনালি

২. দ্বিতীয় কশেরুকার অপর নাম কী ?
ক লাম্বার খ থোরাসিক
গ স্যাক্রাল ঘ অ্যাক্সিস

৩. অক্ষীয় কঙ্কালের অংশ কোনটি ?
ক করোটি খ ক্ল্যাভিকল
গ কর্ণাস্থি ঘ কার্পাল

৪. মুখমন্ডলীয় অস্থিতে ভোমার এর সংখ্যা কত ?
ক ০১টি খ ০২টি
গ ০৩টি ঘ ০৪টি

৫. মুখমন্ডলের আয়তাকার অস্থি কোনটি ?
ক জাইগোম্যাটিক খ ল্যাক্রিমাল
গ ন্যাসাল ঘ প্যালেটিন

৬. কোস্টাল আর্চ নির্মাণ করে–
ক ১ম থেকে ৭ম পর্শুকা খ ৮ম, ৯ম ও ১০শ পর্শুকা
গ ৮ম থেকে ১০শ পর্শুকা ঘ ১১শ ও ১২শ পর্শুকা

৭. হ্যামস্ট্রিং পেশি কোথায় অবস্থান করে ?
ক হাটুসন্ধির পিছনে খ ফিমারের পিছনে
গ জানুসন্ধির পিছনে ঘ উরুর পিছনে

৮. তরুণাস্থিতে থাকে–
i. কন্ড্রোসাইট ii. ম্যাট্রিক্স iii. পীততন্তু
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. কঙ্কালতন্ত্রের যান্ত্রিক কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. সুরক্ষা ii. ভারবহন iii. খনিজ লবণ সঞ্চয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. অনৈচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. নলাকৃতির ii. মাকু আকৃতির
iii. নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. একটি আদর্শ লিভার গঠনে যে অংশগুলো সম্পৃক্ত থাকে–
i. পিভট ii. ভার iii. লিভার বাহু
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. স্থানচ্যুতির প্রাথমিক লক্ষণ হলো–
i. ঐ অস্থি কাজে অক্ষম হয় ii. লিগামেন্ট ছিড়ে যায়
iii. ঐ অস্থি নড়াচড়া করা যায় না
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. থোরাসিক কশেরুকার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. সেন্ট্রাম মাঝারি ও হৃৎপিণ্ড আকৃতির
ii. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণা
iii. স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সরু
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
অস্থিভঙ্গ সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে। এক ধরনের অস্থিভঙ্গ দুই টুকরা হয় এবং চামড়া ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে না।

১৪. উদ্দীপকে যে অস্থিভঙ্গ নির্দেশ করে তার লক্ষণ–
ক প্রচুর রক্তপাত
খ চামড়া ও টিস্যুর মারাত্মক ক্ষতি হয়
গ টেন্ডন ও লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ঘ রক্তজমে কালশিরা পড়ে যায়

১৪. উদ্দীপকে যে অস্থিভঙ্গ নির্দেশ করে তার প্রাথমিক চিকিৎসা হল–
i. ভঙ্গ অস্থি সঠিক স্থানে স্থাপন করা
ii. আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির নড়াচড়া বন্ধ রাখা
iii. ভঙ্গ স্থানে রক্ত প্রবাহ, রক্ত সঞ্চালন ও সংবেদন পরীক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. গ
৬. খ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. গ
১১. ঘ	১২. খ	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মানব কঙ্কালে বিভিন্ন ধরনের যোজক টিস্যু বিদ্যমান। এক ধরনের যোজক টিস্যু পেরিঅস্টিয়াম নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণে আবৃত থাকে। আবার অন্যটি পেরিকন্ড্রিয়াম নামক তন্তুময় আবরণীতে আবৃত থাকে।
ক) সার্জিক্যাল গ্রীবা কী ? ১
খ) অস্থিভঙ্গ বলতে কী বুঝ ? ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত যোজক টিস্যু দুটির পার্থক্য লিখ। ৩
ঘ) "উদ্দীপকে যে সকল যোজক টিস্যুর কথা বলা হয়েছে– তা মানবদেহ গঠনে অপরিহার্য্য"– ব্যাখ্যা কর। ৪

RMDAC

অধ্যায় ১২ প্রাণীর আচরণ
Animal Behavior

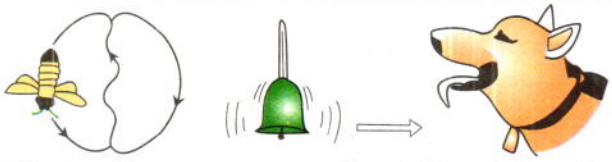

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ইথোলজি
- উদ্দীপনা
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- অপত্য যত্ন
- ইনসটিংক্টস
- ট্যাক্সিস
- সহজাত আচরণ
- শিখন আচরণ
- প্যাভলভ
- অ্যাল্ট্রুইজম

উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়া প্রত্যেক জীবের বৈশিষ্ট্য। **বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে একটি প্রাণীর সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়াকে প্রাণীর আচরণ বলে**। সম্পূর্ণ দেহের সঞ্চালন বা অংশবিশেষের সঞ্চালন, দেহভঙ্গি, মুখের ভঙ্গি, স্বর উৎপাদন ভঙ্গি এমনকি বর্ণের পরিবর্তন, গন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি আচরণের অন্তর্গত। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে **আচরণবিদ্যা** বা **ইথোলজি** (Ethology; গ্রিক *ethos* = আচরণ এবং *logos* = জ্ঞান) বলে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরণ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❐ আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ	পাঠ ১	আচরণ ও আচরণের প্রকৃতি
❐ সহজাত আচরণের ব্যাখ্যা	পাঠ ২	সহজাত আচরণ
❐ প্রতিটি প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাইকরণ	পাঠ ৩	বিভিন্ন প্রাণীর সহজাত আচরণ
শিখন (learning)	পাঠ ৪	অভিপ্রয়াণ
❐ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ওপর Pavlove এর কাজের বর্ণনা	পাঠ ৫	প্রতিবর্তি ক্রিয়া
❐ মৌমাছির সামাজিক সংগঠন এর আলোকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার (altruism) ব্যাখ্যা	পাঠ ৬	সহজাত আবেগ
	পাঠ ৭	শিক্ষণ আচরণ
	পাঠ ৮	সামাজিক আচরণ

অস্ট্রিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী **কার্ল ফন ফ্রিস** (Karl von Frisch, 1886-1982) ও **কনরেড লরেঞ্জ** (Konrad Lorenz, 1903-1989) এবং ডাচ জীববিজ্ঞানী **নিকোলাস টিনবার্জেন** (Nikolaas Tinbergen, 1907-1988)-কে ইথোলজির প্রধান স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ তিনজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণীর আচরণের উপর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁদের ১৯৭৩ সালে শারীরবিজ্ঞান ও মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

Karl von Frisch (1886-1982) | Konrad Lorenz (1903-1989) | Nikolaas Tinbergen (1907-1988)

আচরণের প্রকৃতি (The Nature of Behavior)

বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার প্রেক্ষিতে যে কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। নির্দিষ্ট প্রাণীতে সব সময় একই উদ্দীপনা একই সাড়া ফেলতে পারে না। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাই নয়, সাড়া দানে পার্থক্যের বিষয়টি বহিঃস্থ বা অন্তঃস্থ উদ্দীপনার কারণেও ঘটে থাকতে পারে। যেমন–একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে পেটভর্তি খাবার যে প্রেরণার সৃষ্টি করবে তা ভরপেট প্রাণীতে করবে না।

একটি প্রাণী যদি একদিকে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত থাকে, অন্যদিকে শিকারী প্রাণীর ধাওয়ায় দৌড়ের উপরে থাকে আর তখন যদি লোভনীয় খাবার ওই প্রাণীর মুখের সামনে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তার আচরণ হবে ভিন্ন। বিপদ না যাওয়া পর্যন্ত পলায়নপর প্রাণী কিছুই খাবে না। এভাবে, কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটার পিছনে বিভিন্ন উদ্দীপনার সম্মিলন কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনার এ সম্মিলন **মোটিভেশন** (motivation) বা **প্রেরণা** হিসেবে পরিচিত।

কিছু প্রাণীর জননগত আচরণে মোটিভেশন উপাদান জড়িত থাকে। যেমন– অনেক প্রজাতির স্ত্রী সদস্য বছরের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে জননে অংশ নেয় না। এ সময়কালটি প্রাণিদেহে রজঃচক্রের (এস্ট্রাস চক্র) সঙ্গে জড়িত। তখন নিষেক, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান ঐ প্রাণীর জন্য নিরাপদ ও অনুকূল। এ আচরণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে **জৈবনিক ছন্দ** (biological rhythms)। অনেক প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যে এ ছন্দ (বা মোটিভেশন) মিলে যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার মোটিভেশন প্রয়োজন হয়। প্রাইমেট জাতীয় অনেক স্ত্রী সদস্যে যৌনাঙ্গের রং ও স্ফীতি **এস্ট্রাস চক্রকে** প্রকাশ করে। পুরুষ সদস্য তাতে আকৃষ্ট হয়ে জনন সম্পন্ন করে।

প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

১. আচরণ দিয়ে প্রাণী দ্রুত ও সুবিধাজনক উপায়ে তার পরিবেশের প্রতি সাড়া দেয়।
২. জিন ও পরিবেশ উভয়ের সাহায্যেই প্রাণীর আচরণ প্রভাবিত হয়।
৩. প্রাণীর আচরণ প্রজাতি নির্দিষ্ট। একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সাড়াদানে বিভিন্ন প্রাণি-প্রজাতির মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।
৪. প্রাণীর আচরণ **অভিযোজনিক;** কোনো উদ্দীপক চিনে তার প্রতি সাড়া দেওয়া প্রত্যেক প্রাণীর প্রকৃতিতে টিকে থাকার অনত্যম প্রধান উপায়।
৫. প্রাণীর কিছু আচরণ চক্রাকারে সংঘটিত হয়। এটি দৈনিক, মাসিক, ঋতুভিত্তিক বা বর্ষভিত্তিক হতে পারে। জীবের প্রাত্যহিক চক্রকে **দৈনিক ছন্দোময়তা** (circadian rhythm) বলে যা একটি **জৈবিক ঘড়ি** (biological clock) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬. প্রাণীর আচরণে সহজাত ও শিখন উভয় ধরনের উপাদানই থাকে।
৭. প্রাণীর আচরণ উদ্দীপক নির্ভর; নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রাণীরা নির্দিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করে।
৮. প্রাণীর আচরণ সাধারণত **মোটিভেশন** (motivation) বা **প্রেষণাজাত**। প্রেষণা হচ্ছে প্রয়োজন বা অভাববোধ থেকে সৃষ্ট উদ্দেশ্যমুখী কর্মপ্রচেষ্টা।
৯. প্রাণীর সব ধরনের আচরণের কিছু মূল্য ও সুবিধা থাকে যা অনেক প্রাণীকে সমাজবদ্ধ কিংবা যূথবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে।
১০. মানুষ ব্যতীত অন্যান্য কিছু প্রাণীর আচরণ প্রদর্শনের জন্য জটিল বোধশক্তির প্রয়োজন হয়। এ বোধশক্তি প্রাণীকে সামাজিক জীবনে অভিযোজনের কিছু সুবিধা এনে দেয়।

উদ্দীপনা (Stimulus)

উদ্দীপনা হচ্ছে এমন এক ধরনের সংকেত যা বাণী বহন করে, যাকে শনাক্ত করা যায়। প্রাণীতে আচরণগত পরিবর্তনে এ ধরনের সংকেত সংবেদন সৃষ্টি করে তাই একে **সাংকেতিক উদ্দীপনা** (sign stimulus) বলে। Konrad Lorenz একে নাম দেন Key stimulus। উদ্দীপনা বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ দুটোই হতে পারে। যেমন, মুঠোফোনটি বেজে উঠলে আমরা শব্দ অথবা **কম্পন** (vibration) এর মাধ্যমে তা জানতে পারি– এটি **বহিঃ উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, ক্ষিদে পেলে আমাদের দেহে অন্য এক প্রকার উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যা আমাদের খাদ্য গ্রহণে প্ররোচিত করে। এটি হচ্ছে **অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা**। বাহ্যিক উদ্দীপনা আলো, তাপ, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে সকল প্রাণী একই ধরনের উদ্দীপনা গ্রহণ করে এমন নয়। যেমন, মানুষের ক্ষেত্রে দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ–এই পাঁচ ধরনের উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে। অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে এসব উদ্দীপনা সক্রিয় নাও হতে পারে।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন (Behavioural Changes due to Stimulus)

উৎপত্তি ও কাজের ভিত্তিতে সাংকেতিক উদ্দীপনা তিন ধরনের : মোটিভেশন, রিলিজিং এবং টার্মিনেটিং উদ্দীপনা।

১. **মোটিভেশন (Motivation) বা প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা :** এ উদ্দীপনা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হতে পারে। দিনের সময়কাল বেড়ে গেলে পাখির বিচরণ পরিসীমা রক্ষা ও জনন আচরণ প্রভাবিত হয়। এটি **বাহ্যিক উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, শীতযাপনকালে আহার অন্বেষণের ভয়ংকর বাস্তবতার কথা চিন্তা করে দেহে সঞ্চিত চর্বি থেকে শক্তি আহরণ করার বিষয়টি হচ্ছে **অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা**। প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা প্রাণীকে এমন 'তাড়না' বা 'লক্ষ' ('drive' or 'goal') সরবরাহ করে যাতে প্রাণী দ্বিতীয় সাংকেতিক উদ্দীপনা অর্থাৎ রিলিজিং বা নির্গমণ উদ্দীপনা প্রদর্শনে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

২. **রিলিজিং (Releasing) বা নির্গমণ উদ্দীপনা :** **রিলিজার** হচ্ছে একটি সাধারণ উদ্দীপনা। কোনো প্রজাতির এক সদস্য যখন একই প্রজাতির আরেক সদস্যের উদ্দেশে আচরণগত সাড়ার অংশ হিসেবে ক্রমাগত উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে **রিলিজার** (releasers) বলে। বিখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **লরেঞ্জ** (Lorenz) সর্বপ্রথম Releaser শব্দ প্রয়োগ করেন এবং আরেক পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) আচরণে এর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। **হেরিংগাল** (গাংচিল, *Larus argentatus*)-এর খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সময় রিলিজারের কার্যকারিতার বিষয়টি জানা যায়। হেরিংগাল যখন শাবকদের জন্য খাবার নিয়ে আসে শাবক তখন পিতা-মাতার হলদে রংয়ের নিম্নচোয়ালে অবস্থিত একটি লাল ফোঁটায় ঠোকর মেরে মাছ উগরে দেয়ার সংকেত দেয়। উগরে দেয়া মাছ শাবক হেরিংগাল গলাধঃকরণ করে। বিজ্ঞানী টিনবারগেন ও পারডেক (Tinbergen and Perdeck) এ প্রক্রিয়ার রহস্য উদঘাটনে নিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিক গবেষণা করেন। তাঁরা কাগজের শক্ত বোর্ড দিয়ে পূর্ণবয়স্ক হেরিংগালের মাথা বানিয়ে তাতে ঠোঁটের মধ্যে কড়া বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনকারী (contrast) রংয়ের ফোঁটা মেখে লক্ষ করেন যে ঠোঁটের ফোঁটাই খাদ্য চেয়ে আকুতি জানানোর একমাত্র রিলিজার। শুধু তা-ই-নয়, তাঁরা আরও লক্ষ করেন যে পূর্ণবয়স্কের ঠোঁটে একটিমাত্র ফোঁটার বদলে তাঁদের তৈরি একটি দন্ডের মধ্যে দু-তিনটি আড়াআড়ি দাগ দিয়ে শাবকের চোখের সামনে ধরলে সেটাকে আরও বেশি ঠোকারাতে থাকে।

৩. **টারমিনেটিং (Terminating) বা সমাপ্তিকরণ উদ্দীপনা :** যে উদ্দীপনায় আচরণগত সাড়ার সমাপ্তিকরণ ঘটে তাকে **টারমিনেটিং উদ্দীপনা** বলে। এটি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণও হতে পারে। পাখির দৃষ্টি উদ্দীপনা (visual stimuli) যখন একটি বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মনে করে তখন পাখি বাসা নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এটি হচ্ছে **বাহ্যিক টারমিনেটিং উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, ভরপেট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ পাকস্থলি ভরে না খাওয়া পর্যন্ত) খাওয়া চালিয়ে যাওয়া, পাকস্থলি পূর্ণ হলে অর্থাৎ পরিতৃপ্তির পর খাওয়া বন্ধ করা হচ্ছে **অন্তঃস্থ টারমিনেটিং উদ্দীপনা**।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Behaviour and Heredity)

মানব ইতিহাসের গোড়ার দিকে DNA-র উত্তরাধিকার কিংবা জিনগত তথ্য থেকে শারীরিক, শারীরবৃত্তিক বা আচরণগত অনুবাদের পদ্ধতি সবকিছু ছিল অজানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদি মানুষ তাদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে উত্তরাধিকার কোনো না কোনোভাবে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন মিলন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা মানুষের উপকারী পশু-পাখি পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করতে পেরেছে। গবাদি পশু, পাখি, কুকুর প্রভৃতির আচরণ দেখলেই বোঝা যাবে প্রাণিগুলো ওদের বন্য পূর্বপুরুষ থেকে কতোখানি ভিন্ন। মানব ইতিহাসে উন্নয়নের ধারার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্বাচনমূলক প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত ও প্রাণী বাছাই বিষয়টি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ডারউইন ও মেন্ডেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও বর্ণনা প্রকাশের আগে আমরা উন্নত প্রাণী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল রহস্য জানতে পারিনি।

বর্তমান সময়ে খুব সহজেই জানতে পারছি যে, জিন ও পরিবেশ উভয়ই আচরণকে প্রভাবিত করে। আচরণে এ দুই উপাদানের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। জিনের প্রভাবে প্রাণীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তিক যে

কাঠামো নির্মিত হয় তার ভিতরে পরিবেশের কর্মকান্ডে একেকটি প্রাণিসদস্যে আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিবেশ প্রাণীর দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক পরিস্ফুটনকে প্রভাবিত করতে পারে, সে অনুযায়ী ঐ প্রাণীর আচরণও প্রভাবিত হয়।

জিনগুলো শিক্ষণ, স্মৃতি ও জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলে, প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভান্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় করতে পারে। মানুষ শিক্ষণ আচরণের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে বুঝে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, অন্যদিকে, অনেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ দেখলে মনে হবে স্বয়ংক্রিয় (automatic), অর্থাৎ আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা আচরণ। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত ও জটিল ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। ১৯৬০ সালের আগে প্রাণী আচরণ নিয়ে আচরণবিজ্ঞানীরা দুশিবিরে বিভক্ত ছিলেন: একটি **ইউরোপিয়ান**, অন্যটি **আমেরিকান**। অস্ট্রিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী **কনরাড লরেঞ্জ** (Konred lorenz)-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে **আচরণবিদ্যা** (ethology) দিক নির্দেশনা ফিরে পায়। বিজ্ঞানী লরেঞ্জ আচরণগুলোকে প্রধান দুটি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন একটি **অর্জিত** (acquired), অন্যটি **সহজাত** (innate বা instinct)।

সহজাত আচরণের প্রকাশ ঘটে কোনো প্রাকচিন্তাভাবনা ছাড়াই, তা ছাড়া এ আচরণ শিক্ষণের মাধ্যমে বদলানোরও উপায় নেই। সহজাত আচরণের নমুনা সবার চোখেই পড়েছে। অন্ততঃ অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বললে তেলাপোকা যে দ্রুত অন্ধকার কোণে দৌড়ায়- এ ঘটনা কারও নজর এড়িয়েছে বলে মনে হয় না। এমন ছোট-খাট ঘটনা অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় নির্দিষ্ট সাড়া দেয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষণের কিছু নেই, সম্পূর্ণ **জিনগত** বিষয় জড়িত। বংশপরম্পরায় এ আচরণের পরিবর্তনও হয় না। অনুরূপভাবে, কোনো প্রজাতির সকল সদস্য একইভাবে সংকেতও প্রদর্শন করে। যে সংকেতটি প্রদর্শিত হয় তা ঐ প্রজাতির সকল সদস্যে একই কারণে এবং একইভাবে প্রকাশিত হয়। এক কুকুরের প্রতি রেগে গেলে আরেক কুকুরের মুখের অভিব্যক্তি, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া এবং লেজের ভঙ্গি সার্বজনীন। অর্থাৎ বিষয়টি সহজাত। অন্যান্য প্রাণী জিনগত ও শিক্ষণ তথ্যের সমন্বয়ে সংকেত সৃষ্টি করে। পাখিকে যদি অন্য পাখির গান একেবারেই শুনতে না দেওয়া হয় তাহলেও পাখি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গানের মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্ফুটনকালে নির্দিষ্ট গান শুনতে দিলে পাখিটি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গান নিখুঁত গাইতে পারবে। অর্থাৎ সহজাত আচরণ সব সময় গাঁথুনি হিসেবে কাজ করে।

অর্জিত–সহজাত বিভাজনে (acquired - innate dichotomy) যে বিষয়টি অস্পষ্ট তা হচ্ছে প্রাণীর শিক্ষণ তখনই সম্ভব যখন সে যথারীতি নির্দিষ্ট পথে নিজ আচরণের উৎকর্ষ ঘটাতে জিন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিচালিত হয়। একটি প্রাণীর শিক্ষণ ভাল হতে পারে কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নিজের আচরণের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তা নির্ভর করে প্রাণীর পূর্বপুরুষের জিনগত নির্দিষ্ট সাফল্যের উপর। অন্যদিকে, একটি প্রাণী জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সে অভিজ্ঞতা প্রাণীর জিনকে যেভাবে সক্রিয় করে তা পরবর্তীতে প্রাণীর আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আধুনিক আচরণবিজ্ঞানীরা অর্জিত বনাম সহজাত আচরণকে অত্যন্ত সাদামাটা চোখে দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা, কোনো আচরণই শতভাগ অর্জিত নয়, বা সহজাতও নয়। বরং **সমস্ত আচরণই হচ্ছে জিন ও পরিবেশের এক জটিল মিথস্ক্রিয়া**।

প্রাণী আচরণে বিবর্তন এমনভাবে কাজ করেছে যেন জিন ও পরিবেশ পরিপূরক হয়ে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় যেসব সংকটের মুখোমুখি হয় তার আচরণগত সমাধান বের করতে পারে। সহজাত সাড়া প্রাণীকে আচরণের উপর বংশ পরম্পরায় প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে প্রাপ্ত উপকার পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষণের মাধ্যমে প্রাণী এমন হাতিয়ার অর্জন করে যার সাহায্যে সে স্থানীয় অবস্থা ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাড়া দিতে সক্ষম হয়। মানুষের আচরণ নির্ধারণে জিন ও পরিবেশের আপেক্ষিক ভূমিকা প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মতভিন্নতা। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা উপসংহার টানছেন এ কথা বলে যে **আচরণ হচ্ছে বিবর্তনিক প্রক্রিয়ার ফল যা কখনও জেনেটিক কোডিং-এর মাধ্যমে প্রাণীর জন্য আচরণগত নির্দেশনা সৃষ্টি করে, কখনওবা এমন নমনীয় কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে প্রাণী তার নিজস্ব পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যা নিজের সমাধান করতে পারে।**

সহজাত আচরণ (Innate behavior)

সহজাত আচরণ হচ্ছে এমন আচরণ যা জন্মগত পাওয়া অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ। পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনে প্রজাতির অস্তিত্ব বাঁচাতে সাড়া হিসেবে এ আচরণের প্রকাশ ঘটে। একটি প্রজাতির সকল সদস্যে সহজাত আচরণ এক রকম হয়। যেমন- তরুণ বা বয়স্ক সব বয়সের বাবুই পাখি ডিমপাড়ার সময় হলে যে সুনিপুণ কারিগরি জ্ঞানে বাসা বুনে সেটি সহজাত আচরণ। এ আচরণ বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

সহজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) এটি জিন নিয়ন্ত্রিত, বংশগত আচরণ; একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর জন্য এ আচরণ সুনির্দিষ্ট। (ii) এ আচরণ শিক্ষণের মাধ্যমে বা পূর্ব অভিজ্ঞতায় পরিচালিত হয় না। (iii) এ আচরণ বংশানুক্রমে একইভাবে চলতে থাকে। মাকড়সার জাল বুনন, পাখির বাসা তৈরি বংশানুক্রমে একইভাবে চলে আসছে। (iv) এ আচরণ জন্মগত; কোনো কোনো প্রাণীতে জন্মের পরই এ আচরণ প্রকাশ পায়। যেমন–জন্মের পরই শাবকের মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করা। আবার অনেক প্রাণীতে পরিপক্কতার মধ্যদিয়ে তার আচরণ প্রকাশ পায়। যেমন–সঙ্গী নির্বাচন, পাখির বাসা তৈরি, ডিমে তা দেয়া ইত্যাদি। (v) কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণীরা এ আচরণ করে থাকে যদিও উদ্দেশের ফলাফল সম্পর্কে প্রাণীর কোনো পূর্ব ধারণা থাকে না। (vi) সহজাত আচরণের সঙ্গে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। (vii) এ আচরণ প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করে।

সহজাত আচরণের উদাহরণ: ট্যাক্সিস, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্বভাবজাত আচরণ

১. চলন আচরণ বা ট্যাক্সিস (Taxis)

উপযুক্ত পরিবেশে জীবন যাপনের জন্য প্রাণীরা সংবেদী অঙ্গ ও স্নায়ুতন্ত্রের যৌথ প্রক্রিয়ায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে চলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এটি প্রাণিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং একটি সরল অভিযোজিত আচরণ। কিন্তু যখন বাইরের উদ্দীপকের প্রভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সক্রিয় সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণিদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ প্রাণীরা স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে **ট্যাক্সিস** (taxis, গ্রিক *taeksi* = arrangement বা বিন্যাস; বহুবচনে, taxes) বলে। এতে সংবেদী অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রাণীর দিক পরিবর্তন নির্দিষ্ট উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল।

ট্যাক্সিসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য : (i) চলন শিক্ষালব্ধ আচরণ নয়। (ii) বাহ্যিক উদ্দীপক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। (iii) উদ্দীপকের উৎসের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রাণীর দেহের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। (iv) চলনে সংবেদী অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (v) উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া পজেটিভ অথবা নেগেটিভ হতে পারে। (vi) যেহেতু শিক্ষালব্ধ আচরণ নয় সেহেতু এটি জীবের আচরণে রূপান্তরিত হতে পারে না, আবার একে জীব নিজেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। (vii) এ চলন ক্রিয়ার গতি দ্রুত। (viii) কেবল সচল প্রাণীতে এরূপ চলন দেখা যায়।

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ : বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাড়াদানের ভিত্তিতে ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে, যেমন– উদ্দীপনার উৎস, উদ্দীপনার বিষয়, সংবেদী অঙ্গের উপস্থিতি ইত্যাদি। প্রাণীর অবস্থান পরিবর্তন সব সময় উদ্দীপকের উৎসের সাথে নির্দিষ্ট কোণে সম্পাদিত হয় বা সরাসরি উৎসের দিকে কিংবা উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিস নিম্নোক্ত দুরকম–

১. **পজিটিভ বা ধনাত্মক ট্যাক্সিস (Positive taxis) :** প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।

২. **নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ট্যাক্সিস (Negetive taxis) :** প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

উদ্দীপনার উৎসের ভিত্তিতে জীবে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়–

১. **ফটোট্যাক্সিস (Phototaxis) :** আলোক উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– আলোর প্রতি ঘাসফড়িংয়ের **ধনাত্মক** ও আরশোলার **ঋণাত্মক** ফটোট্যাক্সিস।

২. **থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis) :** তাপ উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– গ্রীষ্মকালে অধিকমাত্রায় মশার প্রকোপ, ছারপোকার আক্রমণ **ধনাত্মক** এবং ব্যাঙের শীতনিদ্রা **ঋণাত্মক** থার্মোট্যাক্সিস।

৩. **হাইড্রোট্যাক্সিস (Hydrotaxis) :** পানির প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– ভেজা মাটিতে কেঁচোর বসবাস ধনাত্মক হাইড্রোট্যাক্সিস।

৪. **কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis) :** বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ– চিনির প্রতি পিঁপড়ার আকর্ষণ **ধনাত্মক** ও কার্বলিক এসিড থেকে সাপের দূরে থাকা **ঋণাত্মক** কেমোট্যাক্সিস।

৫. **জিওট্যাক্সিস (Geotaxis) :** মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ–বিভিন্ন ধরনের পোকার গাছ বেয়ে উপরে উঠা ও পিউপা (pupa) তৈরির সময় নিচের দিকে নামা **ধনাত্মক** ও **ঋণাত্মক** জিওট্যাক্সিস।

৬. **থিগমোট্যাক্সিস (Thigmotaxis) :** স্পর্শানুভূতির প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ–চলাচলের সময় তেলাপোকা তার অ্যান্টেনার মাধ্যমে ক্ষতিকর কোনোকিছুর সংস্পর্শে এলে দ্রুত পলায়ন করে যা **ঋণাত্মক** থিগমোট্যাক্সিস।

৭. **রিওট্যাক্সিস (Reotaxis) :** প্রবাহমান পানির প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– মাছের পোনার স্রোতমুখী চলন **ধনাত্মক** রিওট্যাক্সিস। প্রজনন ঋতুতে ইলিশ মাছেরা স্রোতের উজানে এসে ডিম পাড়ে যা **ঋণাত্মক** রিওট্যাক্সিস।

৮. **গ্যালভানোট্যাক্সিস (Galvanotaxis) :** বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– জলাধারে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনায় অ্যামিবার অ্যানোড (+) হতে ক্যাথোড (−) প্রান্তের গমন **ঋণাত্মক** গ্যালভানোট্যাক্সিস।

৯. **সনো/ফনোট্যাক্সিস (Sono/Phonotaxis) :** শব্দের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ পানিতে শব্দ হলে কিছু মাছ **ধনাত্মক** ও কিছু মাছ **ঋণাত্মক** সনোট্যাক্সিস দেখায়।

MAT 22-23

১০. **অ্যানিমোট্যাক্সিস (Anemotaxis) :** বায়ু প্রবাহের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ– বায়ু প্রবাহের অনুকূলে ও প্রতিকূলে পাখির উড়া **ধনাত্মক** ও **ঋণাত্মক** অ্যানিমোট্যাক্সিস।

১১. **স্টেরোট্যাক্সিস (Sterotaxis) :** মসৃণ ও সমতল তলের প্রতি প্রাণীর সাড়া। উদাহরণ–দেয়াল টিকটিকির দেয়ালে চলাচল **ধনাত্মক** এবং বন টিকটিকির বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো **ঋণাত্মক** স্টেরোট্যাক্সিস।

১২. **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস (Conditional taxis) :** যখন কোনো প্রাণী একই সময়ে দুই বা ততোধিক ট্যাক্সিস প্রদর্শন করে তখন তাকে **সাপেক্ষ ট্যাক্সিস** বলে। যেমন- কিছু প্রজাপতি ডিম পাড়ার জন্য বিশেষ উদ্ভিদের গন্ধ ও সবুজ পাতার দিকে গমন করে।

ট্যাক্সিসের দিকমুখিতার ভিত্তিতে আচরণ নিম্নোক্ত ৫ রকম–

১. **ক্লাইনোট্যাক্সিস (Klinotaxis) :** যেসব প্রাণীতে এ ট্যাক্সিস ঘটে সেসব প্রাণীতে কোনো জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে না, বরং সংবেদগ্রাহী কোষগুলো সমগ্র দেহ জুড়ে, বিশেষ করে সম্মুখ অংশে অবস্থান করে। সম্মুখ অংশটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে উদ্দীপনার ব্যাপকতা যাচাই করে। সবদিক থেকে ব্যাপকতার সমতা এলে প্রাণী সোজা চলতে শুরু করে। ব্লোফ্লাই (blowfly) ও বাটারফ্লাই (butterfly)-এর লার্ভায় এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

২. **মেনোট্যাক্সিস (Menotaxis) :** এ ধরনের ট্যাক্সিসে প্রাণীর দিকমুখিতা থাকে কৌণিক (angular) ধরনের। যেমন–সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন।

৩. **নেমোট্যাক্সিস (Mnemotaxis; Gk, *mneme* = স্মৃতি) :** এটি কোনো প্রাণীর স্মৃতিমূলক সাড়াদান। এসব প্রাণী কোথাও গেলে চলার পথের আশ-পাশের কোনো বস্তুকে চিহ্ন হিসেবে মনে রাখে, ফেরার সময় ওই চিহ্নগুলো মনে করে ফিরে আসে। দুএকটা স্মৃতিচিহ্ন উঠিয়ে নিলে প্রাণীর বাসায় ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. **টেলোট্যাক্সিস (Telotaxis) :** এটি হচ্ছে শক্তিশালী উদ্দীপকের প্রতি সাড়াদান। এ ক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে। একটি মৌমাছি যখন আহারের খোঁজে চাক থেকে বের হয় তখন একদিকে সূর্য, অন্যদিকে ফুল-এ দুটি উদ্দীপক থাকে। এ দুই উদ্দীপকের মধ্যে ফুল-এর উদ্দীপনা বেশি হওয়ায় মৌমাছি ফুলে গিয়ে বসে, ভারসাম্য বজায় রেখে মধ্যপথে অগ্রসর হয় না।

৫. **ট্রোপোট্যাক্সিস (Tropotaxis) :** এটি হচ্ছে দুই বা ততোধিক সংবেদগ্রাহী অঙ্গে একটি উদ্দীপকের উদ্দীপনা একসঙ্গে গৃহীত হলে ভারসাম্যমূলক ট্যাক্সিস। এক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদঅঙ্গ উপস্থিত থাকে। মাছের উকুনে (fish louse) এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

ট্যাক্সিসের অভিযোজনিক গুরুত্ব

ট্যাক্সিসের অভিযোজনিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–প্রজাপতির দিকমুখিতা ও চলন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে; পিঁপড়া ও পাখির বাসায় ফেরার বিষয়টি ট্যাক্সিসের নিয়মে পরিচালিত হয়; এবং ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিসের ফলে মাছির লার্ভা অন্ধকার কোণে পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলতে গেলে, উদ্দীপনায় যথাসময়ে সঠিক সাড়া দিয়ে প্রাণী বংশবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নীড় নির্মাণ, অপত্য যত্ন, আহার সংগ্রহ, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নির্বংশ হওয়া থেকে টিকে থাকে।

২. প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action)

মস্তিষ্ক হচ্ছে দেহের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। দেহের কোনো অংশে মশা বসলে **সংবেদী স্নায়ু** (sensory nerve) দিয়ে সেই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক তখন **চেষ্টীয় স্নায়ু** (motor nerve) দিয়ে হাতের পেশিকে নির্দেশ প্রদান করে, ফলে আমরা হাতটি সরিয়ে নিই অথবা মশাকে মারতে সচেষ্ট হই। কিন্তু অনেক সময় কোনো জরুরি প্রয়োজনে এ নির্দেশ মস্তিষ্কের পরিবর্তে **সুষুম্না কাণ্ড** বা **স্পাইনাল কর্ড** (spinal cord) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– তীব্র আলোতে চোখের পাতা দুটি তাৎক্ষণিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়, গরম ইস্ত্রিতে হাত পড়লে চট করে হাত দূরে সরে যায়। এসব জরুরি প্রক্রিয়াগুলো অনৈচ্ছিক এবং স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রক্রিয়াগুলো হলো **প্রতিবর্ত ক্রিয়া**। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ঐ সময় মশা কামড়ালে আমরা হাত, পা সরিয়ে নেই। এগুলো স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং এটিও এক রকম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। **কোন উদ্দীপকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেশি বা কোন অঙ্গে যে অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে**। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুষুম্না কাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে **প্রতিবর্ত চক্র** নামক এক বিশেষ সংক্ষিপ্ত স্নায়ু পথ দিয়ে ঘটে থাকে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য : (i) সাধারণত অধিকাংশ প্রতিবর্ত ক্রিয়াই সরল প্রকৃতির, কারণ একটি উদ্দীপকের প্রয়োগ দ্বারা মাত্র একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। (ii) এ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক, স্বয়ংক্রিয় (autonomic) এবং সহজাত (innate) বা জন্মগত। (iii) এর পিছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকেনা। (iv) লক্ষ বা পরিনাম চিন্তা দিয়েও এটি পরিচালিত হয় না। (v) কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, তাই এটি স্টেরিওটাইপ (stereotype) ধরনের আচরণ। (vi) এ ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য কাজে (আকস্মিক দুর্ঘটনা, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কাজের চাপ ইত্যাদি) সহায়ক ভূমিকা পালন করে। (vii) প্রতিবর্ত ক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে বা স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন হয়। (viii) যে উদ্দীপকের কারণে প্রতিবর্ত ক্রিয়া শুরু হয়, সেই উদ্দীপক ক্রিয়াশীল থাকা পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালু থাকে। (ix) এ ক্রিয়া সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয়না। (x) উদ্দীপক দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রতিবর্ত চক্র (Reflex Cycle)

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্নায়ুর উদ্দীপনা যে পথে সংঘটিত হয় তাকে প্রতিবর্ত চক্র (reflex arc) **বলে**। এ চক্র পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. **একটি গ্রাহক (Receptor) :** এটি সংবেদী উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

২. **অন্তর্বাহী পথ (Afferent path) :** এটি একটি সংবেদী স্নায়ু যা গ্রাহক অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে নিয়ে যায়।

৩. **কেন্দ্র (Center) :** এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্না কান্ডে অবস্থিত একটি **সিন্যাপস** যার মাধ্যমে অন্তর্বাহী স্নায়ুর উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনে পরিবাহিত হয়।

৪. **বহির্বাহী পথ (Efferent path) :** এটি একটি চেষ্টীয় স্নায়ু। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে প্রভাবিত অঙ্গে প্রেরিত হয়।

৫. **প্রভাবিত অঙ্গ (Effector organ) :** এটি একটি **পেশি** বা একটি **গ্রন্থি** হতে পারে যা যথাক্রমে সঙ্কোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি : প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো।

অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় হঠাৎ আঙুলে সূঁচ ফুটলে, কিংবা গরম পাত্রে হাত লাগলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত ক্ষিপ্রতার সাথে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যায়। এটি একটি **পলিসিন্যাপটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া** যা নিম্নরূপে সংঘটিত হয়:

ধাপ–১ : গরম পাত্রে বা আগুনে হাত লাগলে আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইটসমূহ ব্যথার অনুভূতির উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে গ্রাহক বা ত্বক **রিসেপ্টর অঙ্গ** হিসেবে কাজ করে।

ধাপ-২ : আঙ্গুলের ত্বক থেকে উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে সুষুম্না কান্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে পৌঁছায়।

ধাপ-৩ : সুষুম্না কাণ্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন ও রিলে নিউরনের ডেনড্রাইটের মধ্যবর্তী সিন্যাপস এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (electrochemical process) উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনের ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে এবং অ্যাক্সনে পরিবাহিত হয়ে আঙ্গুলের বা বাহুর পেশিতে পৌঁছায়।

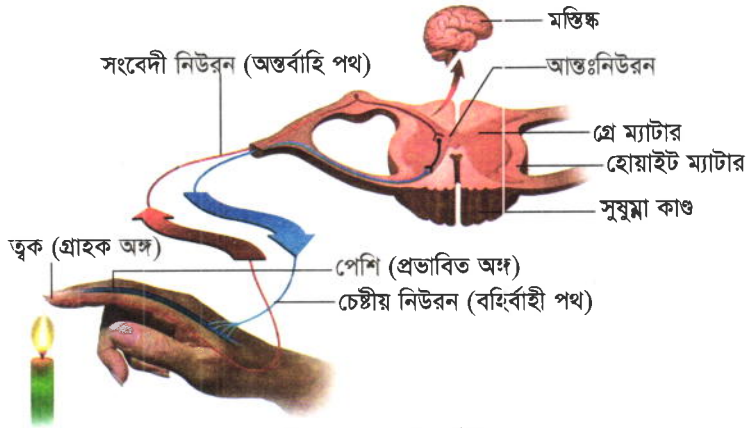

চিত্র ১২.১ : প্রতিবর্ত ক্রিয়া

ধাপ-৪ : স্নায়ু উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে পেশি বা প্রভাবিত অঙ্গের (effector organs) সঙ্কোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনার স্থান থেকে সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিকভাবে হাত সরে যায়। এভাবে একটি **সরল প্রতিবর্ত চক্র** সম্পন্ন হয় এবং **প্রতিবর্ত ক্রিয়া** সম্পাদিত হয়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী **আইভান প্যাভলভ** (Ivan Pavlov) প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করেন।

১. সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স ও ২. অর্জিত বা সাপেক্ষ বা কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স।

১. সহজাত বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স (Unconditioned Reflex) : যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় সেগুলোকে **সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া** বলে। যেমন- (i) খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধে লালা নিঃসৃত হওয়া, (ii) উজ্জ্বল আলোতে চোখের পিউপিলের সঙ্কুচিত হওয়া, (iii) হাতে বা পায়ে গরম সেক বা কাঁটার খোঁচা লাগলে সাথে সাথে হাত বা পা সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি।

সহজাত প্রতিবর্ত আবার তিন প্রকার। যথা–

i. উপরিগত বা সুপারফিসিয়াল প্রতিবর্ত (Superficial Reflex) : উদ্দীপনা যখন ত্বক থেকে গৃহীত হয়। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে পায়ের পাতা সঙ্কুচিত হয়। এটি সুপারফিশিয়াল প্রতিবর্তের উদাহরণ।

ii. গভীর বা ডিপ প্রতিবর্ত (Deep Reflex) : যখন উদ্দীপনা দেহের গভীরে অবস্থিত **টেনডন** (tendon) থেকে গৃহীত; ফলে টেনডন সংলগ্ন পেশি সঙ্কুচিত হয়। পা ঝুলিয়ে বসে হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলে হাঁটুতে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। এটি ডিপ প্রতিবর্তের উদাহরণ।

iii. আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল প্রতিবর্ত (Visceral Reflex) : প্রতিবর্ত ক্রিয়া যখন স্বয়ংক্রিয় (autonomic) এবং দেহের আন্তরযন্ত্রসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন–হৃৎপিন্ড, পাকস্থলি, অন্ত্র, ফুসফুস, মূত্রাশয় ইত্যাদির প্রতিবর্ত।

২. অর্জিত বা কনডিশন্ড রিফ্লেক্স (Conditioned Reflex) : যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের **অর্জিত** বা **কনডিশন্ড রিফ্লেক্স** বলে।

উল্লিখিত প্রধান দুধরনের ছাড়া আরও এক ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখা যায় যা মূলত: একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমষ্টি। যেমন– কোনো ঝাঁঝালো গন্ধে হাঁচি আসে এবং তার সাথে সাথে চোখে পানি আসে। এক্ষেত্রে দুটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া পরপর সংঘটিত হয়েছে বলে একে **ক্রমিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (chained reflex) বলে।

৩. সহজাত বা স্বভাবজাত আচরণ বা ইনসটিংক্টস (Instincts)

সাগর পাড়ে সর্বোচ্চ জোয়ার থেকেও খানিকটা দূরে যে সামুদ্রিক কাছিম ডিম পেড়ে বালু দিয়ে ঢেকে রেখে যায় তা থেকে দুমাসের মাথায় ডিম ফুটে কাছিমের বাচ্চা ফুটে অন্য কোনো দিকে না গিয়ে সোজা সমুদ্রের পানিতে ছুটে যায়। পৃথিবীর সব সামুদ্রিক কাছিমের বাচ্চাই এ কাজ করে। বাচ্চাটাকে কেউ যদি সমুদ্রবিমুখে ঘুরিয়ে দেয় তাহলে খানিকটা থমকে আবার ঘুরে সাগরপানে ছুটে যায়। সাগরপানে ছুটে যেতে কাছিমের বাচ্চাকে কেউ নির্দেশ দেয়নি, বরং এটি জিনগতভাবে স্থায়ী ও বংশগত আচরণ। জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় বংশপরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে সেটাই **ইনসটিংক্ট**।

আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ইনসটিংক্ট হচ্ছে নিসর্গ পরিচালিত এক শক্তি। **ডারউইন** (১৮৫৯) সর্বপ্রথম ইনসটিংক্টের বাস্তবমুখি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠা এক জটিল প্রতিবর্তী। ডারউইনের সংজ্ঞায় প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ বক্তব্যটি উঠে এসেছে যে উত্তরাধিকার সূত্রের মাধ্যমে আগত সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় ইনসটিংক্টের প্রকাশ ঘটে।

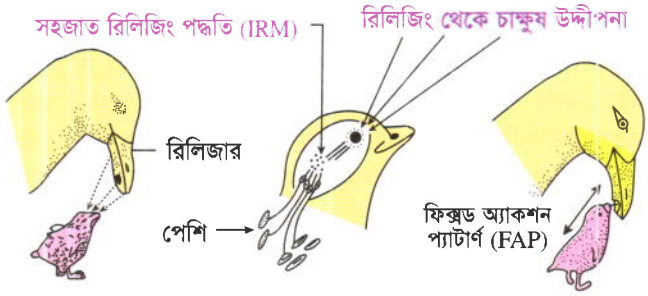

চিত্র ১২.২ : রিলিজারের সঙ্গে IRM ও FAP-এর সম্পর্ক

লরেঞ্জ (Lorenz, 1937) ডারউইনের বক্তব্য মেনে নিলেও কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে প্রত্যেক প্রাণি-প্রজাতির আচরণ কতকগুলো **স্থায়ী** (বা অপরিবর্তনীয়) **অ্যাকশন প্যাটার্ণ** (Fixed Action Pattern, FAP) নিয়ে গঠিত, আর এগুলো হচ্ছে প্রজাতি-নির্দিষ্ট, অতএব জিনগতভাবে নির্ধারিত (genetically determined)। লরেঞ্জ আরও বলেছেন যে প্রতিটি FAP-ই ইনসটিংক্ট এবং প্রাণিদেহে অনেক ইনসটিংক্ট কেন্দ্র রয়েছে। **টিনবারগেন** (Tinbergen, 1951) লরেঞ্জ প্রদত্ত ধারণাকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন।

যা হোক, সদ্যজাত **হেরিংগাল** ও তার মায়ের মধ্যে যে **সাড়া** (response) প্রদর্শিত হয় তা থেকে ইনসটিংক্টের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ক্ষুধার্ত হেরিংগাল ছানা চাক্ষুষ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, বাসায় ছানার উপস্থিতি পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এ **চাক্ষুষ উদ্দীপনা** (visual stimuli) হিসেবে কাজ করে। রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে যে বার্তার সৃষ্টি হয় তা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে বাহিত হয়। এ কেন্দ্রই সুনির্দিষ্ট বার্তার প্রতি নির্দিষ্ট সাড়া দেয়। এ প্রক্রিয়াটি **সহজাত রিলিজিং পদ্ধতি** (Innate Releasing Mechanism, IRM)। IRM নির্দিষ্ট পেশিকে সঙ্কোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দেয়। ফলে ছানার ঠোকর পড়ে পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এর ঠোঁটে অবস্থিত লাল ফোঁটার উপর। এটাই হচ্ছে **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ণ** (FAP)।

FAP এর বৈশিষ্ট্য

বিশ্বখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী লরেঞ্জ (১৯৩২) প্রদত্ত মানদন্ড অনুযায়ী একটি FAP-কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

১. ছাঁচসম্মত (Stereotypy) : আচরণ সব সময় একই রকম হবে।
২. সার্বজনীনতা (Universality) : একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে।
৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত (Independence of individual experience) : বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্যে একই আচরণ প্রকাশিত হবে।
৪. ব্যালিসটিকনেস (Ballisticness) : সাড়া একবার দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষেও তা অপরিবর্তিত থাকে।
৫. উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা (Singleness of purpose) : একটিমাত্র কাজ করে।

টুনটুনি পাখির বাসা নির্মাণ

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা সহজাত আচরণের এক চমৎকার উদাহরণ। এক লম্বালেজি তরুণী টুনটুনি সঙ্গী নির্ধারণ শেষে তার প্রথম নীড় বাঁধার কাজে সক্রিয় হয়। বেশ কয়েকটি গাছ ঘুরে খুঁজে দেখে কোথায় দুটি বড় ঝুলন্ত পাতা রয়েছে যেখানে বাসা বাঁধলে শাবকগুলো নিরাপদে বড় হবে। মনমতো গাছ-পাতা-জায়গা পেলে শুরু করে দেয় বাসা বাঁধা। পাতাদুটির কিনারা ঠোঁট দিয়ে ছিদ্র করে চটের বস্তা সেলাই করার মতো ছিদ্রগুলোর ভিতর দিয়ে মাকড়সার জাল, ককুন-এর রেশম প্রভৃতি দিয়ে সুতা বানিয়ে কিনারাগুলো আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতা যেন ছুটে না যায় সেজন্য বিশেষ উপায়ে গিঁট দিতে ভুলেনা টুনটুনি। টেনে-টুনে দেখে থলির মতো গড়নের বাসা। বাসার মেঝেয় ছোট ছোট ডালের টুকরা, ঘাস বিছিয়ে নরম গদির মতো করে তোলে। এখানে ডিম পাড়া হবে, শাবক পালিত হবে।

চিত্র ১২.৩ : টুনটুনির বাসা নির্মাণ

প্রথমবার যে টুনটুনি বাসা বানায় সে বয়স্ক পাখির নীড় বাঁধার কর্মকান্ড বা কৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও যে বাসাটি বাঁধে সেটি নিখুঁত না হলেও শাবক লালনে চলনসই গণ্য হয়।

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধার প্রক্রিয়া একটি ইনসটিংক্টিভ আচরণের সুলভ ও যথাযথ উদাহরণ।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও সহজাত আচরণের পার্থক্য

প্রতিবর্ত ক্রিয়া	সহজাত আচরণ
১. মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে এ ক্রিয়া স্নায়ুরজ্জু নিয়ন্ত্রিত।	১. মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
২. সরল প্রকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি তাৎক্ষণিক দ্রুত সাড়া দেয়।	২. জটিল প্রকৃতির এবং ধীর গতিতে বিকশিত হয়।
৩. এটি অনেকসময় প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায়।	৩. এটি কখনোই প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করা যায় না।
৪. প্রতিবর্ত ক্রিয়া বুদ্ধিপ্রসূত নয়।	৪. সহজাত আচরণের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট।
৫. প্রতিবর্ত ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এর কাজ সবক্ষেত্রে একই রকম এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিবর্তিত হয় না।	৫. অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিবর্তিত হয়।
৬. প্রতিবর্ত ক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক।	৬. আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক আচরণ।
৭. জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে অপরিহার্য নয়।	৭. জৈবনিক সব প্রয়োজন মেটাতে অপরিহার্য।

সহজাত আচরণ যাচাই

আগেই বলা হয়েছে যে সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় পরিযায়ী পাখিদের নির্দিষ্ট ঋতুতে বংশপরম্পরায় একই বিচরণ ভূমিতে সাময়িক ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অতিবিপন্ন (Critically Endangered, CR) একটি পাখি হচ্ছে **চামচঠোঁটি কাদাখোচা** (Spoon-billed Sandpiper, Eurynorhynchus pygmeus)। এটি প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে আহার, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া থেকে পরিযায়ী হয়। পরিযায়ী পাখি সহজাত আচরণকে কাজে লাগিয়ে বুঝে নেয় কোন সময় ও কোন পথে পরিযায়ী হতে হবে এবং এখানে এসে হাওর-বাওর-নদী ফেলে উপকূলীয় কাদাময় দ্বীপে হেঁটে হেঁটে আহার খুঁজতে হবে–এসব কর্মকান্ড সহজাত আচরণের বহিঃপ্রকাশ। পেটপুরে খেয়েদেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এদের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তি ঘটে।

শীতের পাখির মাইগ্রেশন বা পরিযান

প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই পরিবেশে কিছু না কিছু প্রতিকূল বিষয় থাকে। এসব বিষয় অনেক সময় ঋতুভিত্তিক দেখা দেয়। ঋতুগতভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশ মোকাবিলায় প্রাণী যে সব কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তারই একটি হচ্ছে **মাইগ্রেশন** (migration) বা **পরিযান**। প্রাণী তখন অনুকূল পরিবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে। প্রকৃত অর্থে পরিযান বলতে উভয়মুখি চলাচলকে বুঝায় অর্থাৎ স্থায়ী বাসভূমি থেকে নতুন কোনো অনুকূল পরিবেশে যাত্রা এবং সেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় স্থায়ী বসতিতে প্রত্যাগমন। এরকম যাতায়াত সাধারণত একই পথ অনুসরণ করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়। পাখির পরিযান এধরনের। পাখির জগতে পরিযান ব্যাপক বিস্তৃত। প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের ৪০ শতাংশ পাখি-প্রজাতি পরিযায়ী। পাখিদের পরিযান বিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্যাবৃত ঘটনা, তবে যে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে–খাদ্যের স্বল্পতা, শীতের তীব্রতা, পূর্বপুরুষীয় বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

স্থানীয় পরিযান সাধারণত কয়েকশ ফুট থেকে ১-২ মাইল পর্যন্ত হয়, যেমন-হিমালয়ান পার্ট্রিজ (একধরনের তিতির)। অন্যদিকে, আর্কটিক টার্ণ ১১ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতকালে অ্যান্টার্কটিকার উপকূলে এসে হাজির হয়। কিছু পাখি মাটির সামান্য উপর দিয়ে উড়ে গেলেও সুশৃঙ্খল পরিযানের অংশগ্রহণকারী পাখি মাটি থেকে প্রায় ৩ হাজার থেকে ২০ হাজার ফুট উচ্চকায় আন্দিজ ও হিমালয় পর্বতকেও অতিক্রম করে যায়। পাখিরা সাধারণত একদিনে ৫ - ৬ ঘন্টা উড়বার পর খাদ্য ও পানীয়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, কিন্তু গোল্ডেন পোভার পাখির বিরতিহীনভাবে উড়ে ১৪০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছার প্রমাণ আছে। পরিযানের সময় পাখিরা সৃশৃঙ্খল রীতি মেনে চলে। প্রথমে বয়স্ক পাখিরা পরিযায়ী হতে শুরু করে, পরে স্ত্রী ও তরুণরা অনুসরণ করে। ফিরতি অভিযানে তরুণরাই নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে। পরিযানের নিয়ম ও সময় সবসময় ঠিক থাকে। অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় কিছুটা ব্যতিক্রম না ঘটলে কিছু প্রজাতির পরিযান-সময় ও শীতভূমি পরিত্যাগ-সময় বছরের পর বছর প্রায় একই থাকে, দুএকদিন এদিক-ওদিক হতে পারে। তা ছাড়া, পাখিরা সবসময় একই পথ ধরে পরিযায়ী হয় এবং ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে পৌঁছে।

পরিযানের গমনপথ : পরিযায়ী পাখিরা নিজস্ব গমনপথ ধরে এগিয়ে চলে। এ পথ অনেক সময় একই থাকে। পাখির বিভিন্ন গমন পথের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, উপকূলীয় নদী ও নদী-বিধৌত ভূখন্ড ও পার্বত্য পথ। সমুদ্র পথ সাধারণত সামুদ্রিক পাখিরা ব্যবহার করে। কিছু স্থলচর পাখি সমুদ্র পথে ৪০০ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী কোন স্থানে দ্বীপ থাকলে তারা আরও বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে। বিশেষ করে জলচর পাখিরা উপকূলীয় পথ ধরে পরিযায়ী হয়। সমতল থেকে পাহাড়ে এবং পাহাড় থেকে সমতলে গমনাগমনের সময় পরিযায়ী পাখি নদী ও নদীবিধৌত ভূখন্ডকে গমনপথ হিসেবে বেছে নেয়। এশিয়ার বড় নদীগুলো পরিযানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। খুব কম পাখিই পর্বত অতিক্রম করে। পর্বতগুলো পরিযায়ী পাখিদের নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করে, তবে কিছু জলচর পাখিতে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতেও দেখা যায়। ঐ পাখিদের জন্য এটি একটি গমন পথ।

পরিযানের গুরুত্ব

উপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশনের ফলে পাখি আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পায়; বিচিত্র ও পর্যাপ্ত আহার পায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়; গ্রীষ্মে স্বদেশ ভূমিতে এসে উপযোগী ও নিষ্কন্টক জনন ক্ষেত্র ফিরে পায়, কম কষ্টে পর্যাপ্ত আহার পায়, তখন পাখি সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির মিলনে জিন সংযুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশন পাখির জন্য বেশ বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেমন– অনেক সময় বিরতিহীন ভ্রমণে ক্লান্ত অসংখ্য পাখি সমুদ্রে পড়ে মারা যায়; আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনে, যেমন- প্রবল বর্ষণ, তুষারপাত ও ঝড়ে পড়ে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখি মৃত্যুবরণ করে; তরুণ পাখিরা দূর পরবাসে অনেক প্রাকৃতিক শত্রুর মুখোমুখি হয়; বৈদ্যুতিক তার ও লাইট হাউজ ছাড়াও অগণিত পাখি মানুষের শিকারে পরিণত হয়; এবং মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশ প্রধানত শীতকালে পরিযায়ী পাখির আগমনে মুখরিত থাকে। সারা বছরই পরিযায়ী পাখির আনাগোনা অব্যাহত থাকে। এসব পাখি দেশের পাখি হতে পারে, আবার বিদেশিও হতে পারে। সময়কাল ভেদে এগুলো **গ্রীষ্মকালীন** ও **শীতকালীন** পাখি নামে পরিচিত। কিছু পাখি আছে যা অন্যদেশে যাওয়ার আগে দুএকদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি **ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী**।

বাংলাদেশে যে সব বিদেশি পাখি পরিযায়ী হয় তার বেশির ভাগ আসে হিমালয় ও তার বাইরে থেকে। অনেক প্রজাতির আগমন ঘটে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য (যেমন সাইবেরিয়া) থেকে। অর্থাৎ ইউরেশিয়া থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় শীতে পাখি পরিযায়ী হয়। শরৎ ও বসন্তকালেও কিছু পাখির যাতায়াত চোখে পড়ে। আর দেশি পাখির পরিযান সারা বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় **৫০০ প্রজাতির স্থায়ী পাখি** রয়েছে, অস্থায়ী বা **বিদেশি পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০**। অনেক বিদেশি পরিযায়ী পাখি রয়েছে যা স্বদেশে বিপন্ন বা অতিবিপন্ন হয়ে আছে এমন পাখিও বাংলাদেশে এসে কিছু দিনের জন্যে হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে যায় (যেমন-Spoon-billed Sandpiper)। বাংলাদেশে হাঁস, রাজহাঁসসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখিসহ অসংখ্য শিকারি পাখিও (চিল, বাজ) পরিযায়ী হয়। এসব পাখি দেশের বড় বড় হাওড়, নদী ও উপকূল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। লক্ষ লক্ষ সদস্যের দৃশ্যমান পরিযায়ী পাখির পাশাপাশি অদৃশ্য পতঙ্গভুক্ত পাখিরা বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত মাইগ্রেটরি পাখি দেখার ধূম পড়ে যায়। সমস্ত হাওর এলাকা পরিযায়ী পাখির জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে, আইনে বিশেষ বিধান করে এগুলো সুরক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপসংহার : পাখি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। এদের পরিযান হচ্ছে একদিকে প্রাণিজগতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, অন্যদিকে, অন্যতম রহস্যময় ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তা অবলোকন করেছে, নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও এর রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। কিসের আশায় ও কিসের নেশায় পাখি পরিযায়ী হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সেই নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে পারলে হয়তো মানব প্রজাতিও তা কাজে লাগাতে পারবে।

মাকড়শার জাল (Spider Web)

মাকড়শার বৃত্তাকার জালক হচ্ছে অতি জটিল ও অপরিবর্তনীয় আচরণগত প্যাটার্নের ফলশ্রুতি। মাকড়শার অস্তিত্ব রক্ষায় এ জাল মূল ভূমিকা পালন করে। জালটি উড়ন্ত শিকার ধরার ফাঁদ হিসেবে কাজ করে, জালের সুতার উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে মাকড়শা নিজে দৌড়াতে পারে।

মাকড়শা বৃত্তের জাল বোনে রেশমি সুতা দিয়ে। উদরীয় বিশেষ সিল্ক গ্রন্থি (silk glands) থেকে ক্ষরিত পদার্থকে শতশত অণুনালিকাযুক্ত তিনজোড়া বুননকারী (spinnerets)-র মাধ্যমে সুতা নির্মাণ করা হয়। সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **স্ক্লেরোপ্রোটিন** (scleroprotein) থেকে সৃষ্ট সুতা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা মাকড়শার সুতা বেশি শক্তিশালী। টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে ছেঁড়ার আগে এ সুতা এক-পঞ্চামাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

সারা পৃথিবীতেই মাকড়শা জাল বোনে, সময় লাগে আধ ঘন্টারও কম। মাঠে যেসব মাকড়শা বাস করে তাদের অধিকাংশই খুব ভোরে সুর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন– এতে রয়েছে কাঠামো frame), **অরীয় স্পোক** (radial spokes) এবং **আঠাল প্যাঁচ** (viscid spirals)। **হ্যান্স পিটার্স** (Hans Peters, 1939) সর্বপ্রথম মাকড়শার জাল বোনার ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

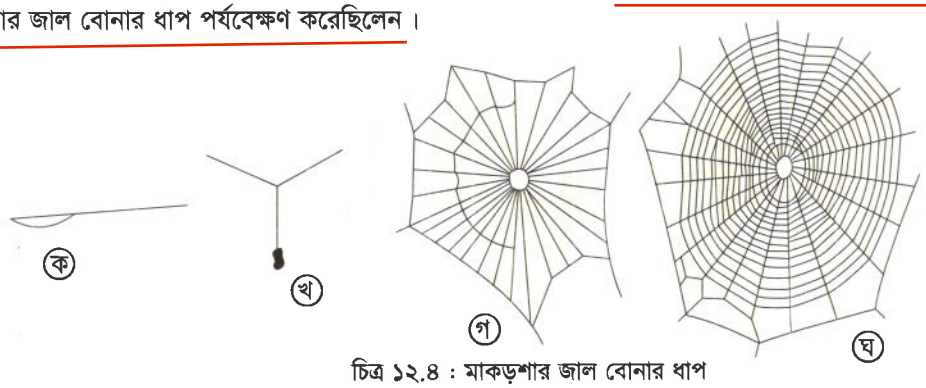

চিত্র ১২.৪ : মাকড়শার জাল বোনার ধাপ

মাকড়শার জাল বোনার শুরুতে একটি Y-আকৃতির ভারা (রাজ মজুরদের মাচা) নির্মাণ করে, এরপর কাঠামো ও অরীয় স্পোক, এবং সবশেষে অন-আঠাল ও আঠাল প্যাঁচ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ধাপে সৃষ্ট জালকগুলো সঠিক কোণ ও দূরত্ব অনুসরণ করে নির্মিত হয়। এভাবে নিখুঁত কৌণিক বৃত্তাকার জাল নির্মাণ মাকড়শার সহজাত আচরণের অন্যতম উদাহরণ।

অপত্যের প্রতি যত্ন– মাছ, ব্যাঙ, পাখি (Parental Care—Fish, Toad, Bird)

ডিমপাড়া বা সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে এদের লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মাতা বা পিতা কিংবা উভয়ের সহজাত আচরণ। **শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা কর্তৃক পরিচর্যা নেওয়াকে অপত্যের প্রতি যত্ন-নেওয়া বা** Parental care **বলে**। মাছ, উভচর, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এরূপ আচরণ লক্ষ করা যায়।

মাছের অপত্য যত্ন

প্রাণী আচরণ গবেষণায় **তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক** (Three-spined stickleback, *Gastrosteus aculeatus*) মাছের গুরুত্ব অনেক। এ মাছের বিস্তৃতি দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর (Black sea), দক্ষিণ ইতালি, আইবেরিয়ান পেনিনস্যুলা, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের উত্তর অংশে, উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীনল্যান্ডে। আচরণবিদ্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মাছের আচরণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। প্রখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে এ মাছের অপত্যের প্রতি যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

এক থেকে তিন বছর বয়সে তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক পরিণত (mature) হয়। জননকাল ছাড়া অন্য সময়ে ঝাঁকবদ্ধ হয়ে বাস করে। বসন্তকালে অর্থাৎ জননকালে পরিণত স্টিকলব্যাকেরা দলহীন হয়ে উপকূলবর্তী অগভীর পানির জলাশয়ে নিজস্ব বিচরণ পরিসীমা নির্ধারণ করে সর্তক পাহারায় নিযুক্ত থাকে। কারও অনুপ্রবেশে হানাহানি না করে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও বর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বিচরণ পরিসীমা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাসা নির্মাণ শুরু করে। বাসা নির্মাণে শুধু পুরুষ সদস্যই কাজ করে। বাসা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গার তলদেশ থেকে মুখভর্তি বালু তুলে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দূরে নিক্ষেপ করে। এভাবে একটি অগভীর গর্তের সৃষ্টি হলে পুরুষ মাছ সূত্রাকার শৈবাল ও অন্য জলজ উদ্ভিদ, নুড়ি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ জড়ো করে বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এক ধরনের প্রোটিনজাত আঠালো পদার্থে আটকে দেয়। সকল তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের বাসার নির্মাণশৈলী এক হয় না, স্বতন্ত্র রুচির বিষয় মাছের বেলায়ও প্রযোজ্য। কোন কাঠামো কোন স্ত্রী মাছের পছন্দ হবে তারও ব্যাপার আছে। যা হোক, বাসাটি দুমুখ খোলা, মধ্যভাগ ফাঁকা ও সামান্য চওড়া ধরনের।

বাসা নির্মাণ শেষ হলে পুরুষ মাছ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্ত্রী মাছকে আকৃষ্ট করে বাসায় ঢুকিয়ে লেজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডিম পাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ডিম পাড়া শেষ হলে পুরুষ মাছ অতিদ্রুত বাসায় প্রবেশ করে ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে। একটি বাসায় দু-তিনটি স্ত্রীমাছ ডিম পাড়তে পারে। এরপর পুরুষ মাছটি পিতা ও মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করে ডিমের দেখা শোনা আরম্ভ করে।

চিত্র ১২.৫ : তিন কাঁটা স্টিকলব্যাকের সুরক্ষিত নীড়ে ডিম ছাড়া

নীড় ও নীড়ের ভিতর থাকা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে সুস্থ পোনা উৎপাদন, রক্ষা, যত্ন নেওয়া ও সবশেষে নিরাপদে পরিবেশে ফিরে যাওয়া অনুকূলে রাখতে পুরুষ মাছ সদাব্যস্ত থাকে। এ সময় বাসার কাছে নিজ প্রজাতির সদস্যসহ কোনো মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণীর প্রবেশ রোধ করতে মাছ সদা তৎপর থাকে। ডিম ফোটার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্টিকলব্যাক এক অদ্ভুত আচরণ করে। বাসায় প্রবেশ পথের সামনে মাথা নিচু করে তীর্যকভাবে অবস্থান নিয়ে বক্ষপাখনা সামনের দিকে সঞ্চালিত করে। এভাবে অক্সিজেন চাহিদা নিশ্চিত করতে পানিস্রোত অব্যাহত রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম **ফ্যানিং** (fanning)।

সাত-আটদিনের মধ্যে ডিম ফুটে পোনা বেরিয়ে বাসা ত্যাগ করতে শুরু করলে ফ্যানিং বন্ধ করে দেয়। পোনাগুলো পাহারা দেওয়ার সময় স্টিকলব্যাক আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। পোনার দল অটুট রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কারণে দলের কিছু পোনা দলছুট হলে পুরুষ মাছটি দ্রুত সেগুলোকে মুখে তুলে এনে মূলদলে ছেড়ে দেয়। দুসপ্তাহ পর পোনা দলবদ্ধ চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে অতিযত্ন ও সতর্কতার মধ্যে রেখে বড় করে তোলা ভবিষ্যৎ বংশধরগুলোকে ছেড়ে নিজের পূর্ণবয়স্ক ঝাঁকে ফিরে যায়।

ব্যাঙের অপত্য যত্ন

ভবিষ্যৎ বংশধরের পরিস্ফুটন যেন নির্বিঘ্ন হয় সে উদ্দেশে সর্তক-সযত্নে বাসা নির্মাণ করে ডিম পাড়া কিংবা সদ্য পরিস্ফুটিত বংশধর বেড়ে না উঠা পর্যন্ত পিতা-মাতার যে কোনো একজন বা উভয়কেই সঙ্গে থাকাকে **অপত্য যত্ন** বলে। অপত্য যত্ন অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি যা প্রায় সব প্রাণিগোষ্ঠীতেই কম-বেশি দেখা যায়। উভচরেও বিচিত্র অপত্য যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে গ্রীষ্মমন্ডলীয় উভচরে এমন যত্নের উদাহরণ বেশি। উভচরের অপত্য যত্নকে প্রধান দুটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়: (ক) বাসা, আঁতুরঘর বা আশ্রয় নির্মাণের মাধ্যমে যত্ন এবং (খ) ডিম বা লার্ভা পরিবহনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ যত্ন।

নিচে **গ্লেডিয়েটর ব্যাঙ** নামে পরিচিত দক্ষিণ আমেরিকার (*Hypsiboas rosenbergi*) গেহো ব্যাঙের অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

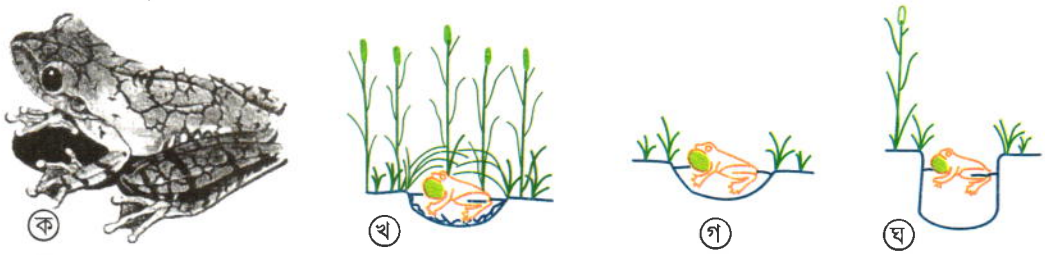

চিত্র ১২.৬ : *Hypsiboas rosenbergi* : (ক) একটি পুকুর ব্যাঙ; (খ) পুরুষ ব্যাঙের স্বহস্তে বাসা নির্মাণ; (গ) কর্দমাক্ত গর্ত নীড়ে পরিণত; (ঘ) গবাদি পশুর পায়ের চাপে কর্দমাক্ত গর্তকে নীড়ে পরিণত করা।

কাদা-মাটির নীড় (mud-nest) নির্মাণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার উদ্দেশে বসতির আশেপাশে পুকুর, ডোবা বা এ ধরনের স্থায়ী জলার পাড়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। জননকালে পুরুষ ব্যাঙ এমন এক জায়গা বেছে নেয় যাতে গর্তখোঁড়া সহজ হয়, নির্মাণ কাজ রাতারাতি সম্পন্ন হয়। বাসা নির্মাণ, সে বাসা স্ত্রী ব্যাঙের পছন্দ হওয়া এবং নিরাপত্তা বিধান সবকিছু মাথায় রেখে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম পাড়ে। অতএব বাসা নির্মাণকে প্রাধান্য দিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় পুরুষ ব্যাঙকে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ব্যাঙ তিন উপায়ে বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত সে নিজেই বাসা বানায়; দ্বিতীয়ত পানি ভর্তি অগভীর গর্তকে সামান্য মেরামত করে বাসায় পরিণত করে; এবং তৃতীয়ত অন্য এক পুরুষ ব্যাঙের নির্মিত বাসা দখল করে নেয়। এখানে আলোচ্য গ্লেডিয়েটর পুরুষ ব্যাঙ সাধারণত বেলে বা কাদামাটিতে আগে থেকে কোনো কারণে সৃষ্টি হওয়া গর্তকে দ্রুত বাসা বানিয়ে ফেলে। আগের জনন ঋতুতে ব্যবহৃত বাসাকে ডিম পাড়ার উপযোগী করেও কাজে লাগাতে পারে। গবাদি পশু হেঁটে গেলে জলার কিনারে যে গর্ত হয় সেটাকেও একটু বড়সড় ও মসৃণ করে ডিম পাড়ার উপযোগী করে নিতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ গর্ত খুঁড়তে গিয়ে এমনভাবে মাটি সরায় যাতে মাটি স্তূপাকারে পড়ে গেলে উঁচু কিনারার রূপ নেয়। গর্তের ব্যাস প্রায় ১২-৩৭২ সেন্টিমিটার, আর ৫-৭ সেন্টিমিটার গভীর। তিরিশ মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হলে পুরুষ ব্যাঙের ডাকে স্ত্রী ব্যাঙ সাড়া দিলেও বাসা ঘুরে-ফিরে দেখে পছন্দ হলে তবেই ডিম ছাড়তে উদ্যত হয়। ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হলে ওদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, নিরাপত্তা বজায় থাকে সবদিক বিবেচনা করে স্ত্রী ব্যাঙ সিদ্ধান্ত নেয়। ডিম ছাড়ার পর এলাকাভেদে পুরুষ ব্যাঙ তার বংশ রক্ষায় তৎপর থাকে। যেখানে বাসা তৈরির জায়গা কম কিন্তু পুরুষ ব্যাঙের সংখ্যা বেশি থাকে সে সব জায়গায় আগ্রাসী বা সন্ত্রাসী পুরুষ ব্যাঙ অন্য ব্যাঙের বাসা দখল করে স্ত্রী ব্যাঙকে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অবস্থা বুঝে পুরুষ ব্যাঙ শক্ত হাতে বাসা রক্ষা করে। লার্ভা তরুণ ব্যাঙে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত গর্তের পাশে থেকে পাহারা দেয়।

গ্লেডিয়েটর ব্যাঙে মার্চ-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জননকাল হিসেবে পরিচিত। স্ত্রী ব্যাঙ উপযুক্ত বাসায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ডিম ছাড়ে। দুই তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হয়। চল্লিশ দিনের মধ্যে এদের রূপান্তর ঘটে।

পাখির অপত্য যত্ন

পাখিমাত্রই অপত্য যত্নে সমৃদ্ধ প্রাণী। সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অপত্য যত্নে পাখি একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। কোনো প্রাণীর জনন সাফল্য নির্ভর করে সুস্থ-সবল সন্তানকে প্রকৃতির বুকে স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে তার বাস্তুগত ও প্রজননিক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা। এখানে **ছোট পানকৌড়ি** সংক্ষেপে **পানকৌড়ি** (Little cormorant, *Phalacrocorax niger*) পাখির অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

বাংলাদেশে পানকৌড়ির জননকাল মে-অক্টোবর। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে নীড় বাঁধার হার সবচেয়ে বেশি হয়। জননকালে এদের গায়ের ও মুখমন্ডলের পালকের রংয়ে পার্থক্য দেখা দেয়। পানকৌড়িরা যেখানে বাসা বাঁধে সেখানে ছোট বক (Egretta garzetta) ও কানি বক (Ardeola grayii)-ও বাসা বাঁধে। প্রধানত আম ও বট গাছ, সঙ্গে বড়ই, শেওড়া গাছেও বাসা বাঁধে। পানির ধারে ও সহজে মানুষের হাতের নাগালে পাওয়া যায় না এমন উচ্চতায় (৬–১০ মিটার) বিভিন্ন গাছের খড়কুটা দিয়ে অর্থাৎ বাসা বাঁধার জায়গার আশেপাশে যে সব খড়কুটা পাওয়া যায় তা দিয়ে জোড়ের উভয় সদস্য বাসা বাঁধে। বাসার গড় ব্যাস প্রায় ১৫ সে.মি., গভীরতা প্রায় ৫.৫ সে.মি.। দলবেঁধে বাসা বানানোয় অন্য কোনো ক্ষতিকর প্রাণী সহজে কাছে যাওয়ার সাহস পায় না। কাছে গেলেও সমবেত চিৎকারে পালিয়ে যায়। পাঁচ থেকে এগারো দিনের মধ্যে বাসা বাঁধা শেষ হলে পানকৌড়ি একদিন পর পর ২–৬ টি সাদা বা নীলচে-সাদা ডিম পাড়ে। তবে প্রথম ডিম পাড়ার পর পরই ডিমে তা দিতে শুরু করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় সদস্যই তা দেওয়ার কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে শাবক বেরিয়ে আসে।

পানকৌড়ি শান্তশিষ্ট পাখি। দলবদ্ধ থাকায় শিকারী পাখির হামলা প্রতিরোধ সহজ হয়। কিন্তু দুরন্ত কিশোরদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। ডিম ও শাবক নষ্ট হওয়ার প্রধানতম কারণ হচ্ছে খেলাচ্ছলে বা ঘরে পোষার জন্য শাবক চুরি, আর খাওয়ার জন্যে ডিম চুরি। প্রচন্ড ঝড়-তুফানেও ডিম ও শাবকের ক্ষতি হয়। এ প্রতিকূল পরিবেশেও শাবকদের যত্ন নেওয়ার কাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়, শাবকের শরীর প্রথম সাত দিন একেবারে

নগ্ন থাকে। শরীরের সংবেদনশীল ত্বক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বাসা নির্মাণের মাল-মসলার মধ্যে সরু আঁশ, শুকনো পাতা ইত্যাদি থাকে, সে সঙ্গে চলে বিরামহীন শাবকগুলোকে আগলে রাখার চেষ্টা করা। রাতে সারাক্ষণ স্ত্রী পাখি বাসায় বসে থাকে, পুরুষ পাখি বাসার কাছাকাছি ডালে বসে পাহারায় থাকে। ১৫–২০ দিন পর্যন্ত পানকৌড়ি শাবকদের আগলে রাখে। এক মাসের মধ্যেই পানকৌড়ির শাবক নীড় ছেড়ে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম হয়ে উঠে।

শিখন/শিক্ষণ আচরণ (Learning or Learned Behaviour)

প্রতিটি প্রাণী নির্দিষ্ট সহজাত আরচণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা তার জীবন যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলনের জন্য এ আচরণ যথেষ্ট নয়। বরং তাকে টিকে থাকতে হলে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন নতুন কৌশল রপ্ত করতে হয়। অর্জিত ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তিত এ আচরণই **শিখন** বা **শিক্ষালব্ধ আচরণ**। শিখন আচরণ বংশানুসরণযোগ্য নয় অর্থাৎ প্রাণীর ব্যক্তি জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। **C.T Morgan** ও **R.A. King** (১৯৬৬) অনুযায়ী-**অতীত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও সমাজ স্বীকৃত পরিবর্তনই হচ্ছে শিখন**।

শিখন আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) জন্মগত নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। (ii) জটিল প্রকৃতির এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। (iii) বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না। (iv) অভিযোজনীয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বিকাশিত হয়। (v) উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। (vi) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। (vii) প্রজাতি নির্দিষ্ট নয়।

শিখন একটি জীবনব্যাপী আচরণ। সাধারণত প্রাণীকে আট ধরনের শিখন আচরণ করতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে– (i) **অভ্যাসজনিত শিখন** (Habituation); (ii) **অনুকরণ** (Imprinting); (iii) **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (Conditioned reflex); (iv) **চেষ্টা ও ত্রুটির মাধ্যমে শিখন** (Trial and Error learning); (v) **সুপ্ত শিখন** (Latent learning); (vi) **অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন** (Insight learning); (vii) **যৌক্তিক শিখন** (Reasoning); (viii) **বোধসূচক শিখন** (Cognition)। (পাঠ্যসূচি অনুযায়ী এখানে কেবল অভ্যাসজনিত শিখন ও অনুকরণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।)

অভ্যাসজনিত শিখন (Habituation)

অভ্যাসজনিত আচরণ হচ্ছে সরলতম ধরনের শিখন। এ ধরনের আচরণে কোনো পুরস্কার বা তিরস্কারের (শাস্তির) সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি উদ্দীপনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির ফলে আচরণগত সাড়াদানে ক্রমশ ভাটা পড়ে যায়, এক সময় প্রাণী ওই উদ্দীপনায় আর কোনো সাড়াই দেয় না। এ আচরণের মাধ্যমে প্রাণী নতুন পরিবেশে ক্রমান্বয়ে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে অভিযোজিত হয়। অভ্যাসগত আচরণে প্রাণী শুধু নতুন উদ্দীপনায় অভ্যস্তই হয় না, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা বর্জনেও উদ্যোগী হয়।

যেমন– একটি পোষা কুকুরের উপস্থিতিতে শব্দ করলে কুকুরটি মাথা উঁচু করে সাড়া দেয়। যদি ঘন ঘন শব্দ সৃষ্টি করা হয় তখন আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। এ পরিবর্তন অবসাদগ্রস্ততার কারণে কিংবা সংবেদগ্রাহকগুলোর অভিযোজনের ফলে ঘটে না, বরং অভ্যাসজনিত কারণে ঘটে থাকে। এ সাড়াদান দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হলে প্রাণীটি ওই উদ্দীপনায় আর কখনওই সাড়া দেবে না। তা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর প্রয়োগ করলেও কাজ হবে না। প্রাণিজগতের তথা জীবজগতের সব গোষ্ঠীতেই, অভ্যাসগত শিক্ষণ আচরণ দেখা যায়। শস্যক্ষেতে আপদ পাখি তাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের সবখানে মাটির হাড়িতে রং মেখে যে ভয়াল চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় তা দেখে আপদ পাখি কিছুদিন ভয়ে থাকে। পরে চলৎশক্তিহীন গড়নটিকে আর আমলে নেয় না, বরং ফিঙ্গে পাখির বসার জায়গা হয় (পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্যে উড়তে সুবিধা হয়)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে। রেলস্টেশনের পাশে অবস্থিত বাসা বাড়ীতে ট্রেনের শব্দে রাত যাপনের কথা অনেকে চিন্তাই করতে পারবে না, কিন্তু কিছুদিন বাস করলে ট্রেনের শব্দ বা হুইসেল কোনোটাই আর ঘুমের ব্যাঘাতের কারণ হবে না। এটাই অভ্যাসজনিত আচরণ। মাথার উপরে বিরক্তিকর শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরতে থাকা ফ্যানের শব্দে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বা আলোচনা সভা কোনটিতেই এর প্রভাব পড়ে না। এ আচরণের সমস্ত আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও পুনরুদ্ধার (recovery) একটি নিউরন ও নিউরোমাসক্যুলার সংযোগেও প্রদর্শিত হতে পারে।

অনুকরণ (Imprinting)

অনুকরণ অন্যতম শিখন আচরণ। এটি হচ্ছে প্রাণীর পরিস্ফুটনকালে তরুণ প্রাণীতে অত্যন্ত সংবেদনশীল ধাপে (critical period) একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতি সৃষ্ট স্থায়ী আচরণ। ডিম ফুটে সদ্যজাত হাঁসশাবক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে সক্ষম হলেই নীড় ছেড়ে কেবল মাকে অনুকরণ করে দূরে চলে যায়, অন্য কাউকে অনুসরণ করে না। কিন্তু ডিম যদি ইনক্যুবেটারে ফুটানো হয় কিংবা ডিমফুটে হাঁসশাবক বের হওয়ার পরপরই মা-হাঁসকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে শাবকগুলো চোখ মেলে প্রথম যে বড় সচল বস্তু দেখবে তাকেই অনুসরণ করবে। তরুণ বয়সেও ওই সচল বস্তুকে অনুসরণ করে চলবে। তখন আসল মাকে ফিরিয়ে দিলেও 'নকল' মা-ই ওদের কাছে আসল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ নকল মা-ই হাঁস শাবকদের কাছে আসল মা হিসেবে স্থায়ীভাবে 'মুদ্রিত' হয়ে যাবে। এভাবে পরিস্ফুটনের মুহূর্তে কোনো সচল বস্তু, ব্যক্তি কিংবা গন্ধ-ও উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করতে পারে। পরিস্ফুটনকালে সংবেদনশীল মুহূর্ত প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময়কাল জন্মের কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন বা মাস এমনকি কয়েক বছরও হতে পারে। তবে জন্মের পর পাখি বা স্তন্যপায়ীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালনের উদ্যোগ নিলে পোষ মানানো সহজ হয়। সার্কাসে পশু নিয়ে খেলা দেখানোর প্রাণিগুলোকে একারণে খুব কম বয়সে আসল মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

শুধু সচল বড় বস্তুই নয়, আগেই বলা হয়েছে যে, গায়ের গন্ধও শাবকরা অনুসরণ করে। **চিকা** (shrew) নামে পরিচিত গন্ধ মুষিকের শাবকেরা মায়ের গায়ের গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়। বাচ্চাসহ কোথাও যেতে চাইলে মায়ের গা থেকে ক্ষরিত গন্ধে শাবকরা একজন আরেকজনের শরীর কামড়ে ধরে রেলের বগির মতো পরস্পরের পেছনে থেকে অগ্রসর হয়, মায়ের অবস্থান থাকে একেবারে সামনে। গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের পর ৫ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মুষিকশাবকেরা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ৫-৬ দিন বয়সী শাবকদের যদি অন্য প্রজাতির মা-মুষিককে বিকল্প হিসেবে দেওয়া হয় তাহলে 'বিকল্প' বা 'নকল' মাকেই আসল মনে করে দিন কাটায়। দিন ১৫ পর যদি শাবকগুলোর কাছে আসল মাকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলেও আর গৃহীত হয় না। কিন্তু বিকল্প মায়ের গায়ের গন্ধে মাখানো কাপড়ের টুকরাকেও তারা অনুসরণ করতে রাজী থাকে।

সহজাত আচরণ ও শিখন আচরণের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত আচরণ	শিখন আচরণ
১. সহজাত আচরণ জন্মগত, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।	১. শিখন আচরণ জন্মগত নয়, বরং অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত।
২. সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয়।	২. শিখন আচরণ বংশপরম্পরায় প্রদর্শিত হয় না।
৩. সহজাত আচরণ প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট।	৩. শিখন আচরণ প্রজাতির জন্য সুনির্দিষ্ট নয়।
৪. সহজাত আচরণ স্থির অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল।	৪. শিখন আচরণ অস্থায়ী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল।
৫. সহজাত আচরণ অভিযোজনের ফলে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত হয় না।	৫. শিখন আচরণ অভিযোজনের ফলে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত হয়।
৬. সহজাত আচরণ সাধারণত স্বভাবজাত, এর সাথে বুদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈপুন্যের প্রয়োজন হয়।	৬. শিখন আচরণ স্বভাবজাত নহে, এর সাথে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে।
৭. সহজাত আচরণ অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়।	৭. শিখন আচরণ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়।
উদাহরণ: বাবুই পাখির বাসা নির্মাণ, মাকড়সার, জাল বোনা প্রভৃতি।	উদাহরণ- কারখানার শব্দময় পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে পারা, জন্মের পর শিশুর মনোজগতে মায়ের ছাপ পড়া এবং মাকে অনুসরণ করা প্রভৃতি।

Pavlov এর তত্ত্ব

ইভান পিত্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan Petrovich Pavlov, 1849 – 1936) ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত রুশ শারীরবিজ্ঞানী (Physiologist) ও মনোবিজ্ঞানী (Phychologist)। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) সম্বন্ধে তিনি যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুকুরের দেহে কিভাবে এসব প্রতিবর্ত সৃষ্টি হয় ও কাজ করে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। ১৯০৪ সালে তিনি শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কুকুরের লালার প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action of Dog's Saliva)

বিজ্ঞানী **প্যাভলভ** প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন : (১) **অনপেক্ষ** (unconditioned) এবং (২) **সাপেক্ষ** (conditioned) প্রতিবর্ত ক্রিয়া। অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত এবং কোনো শর্তের অধীন নয়। অন্যদিকে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত নয়, বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এবং শর্তের অধীন। কুকুরের লালা ক্ষরণের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ।

বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের দেহে পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। কুকুরদের খাওয়া পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলেন গবেষণাগারের নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান। প্যাভলভ লক্ষ করেন, শুধু খাবার দেখলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হতো না, যে টেকনিশিয়ান খাবার পরিবেশন করতেন তাঁর গায়ের সাদা গবেষণা কোট (lab-coat) দেখলেই লালাক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্যাভলভ ধারণা করেন যে খাবার দেওয়ার সময় সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা যদি কুকুরের চারপাশে থাকে তাহলে সেই উদ্দীপনা খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কুকুরের লালাক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। এ উদ্দীপনাকে তিনি মানসিক উদ্দীপনা (psychic stimulation) নামকরণ করেছেন। প্রাথমিক এ ধারণার ভিত্তিতে প্যাভলভ প্রকৃত গবেষণায় নিয়োজিত হন।

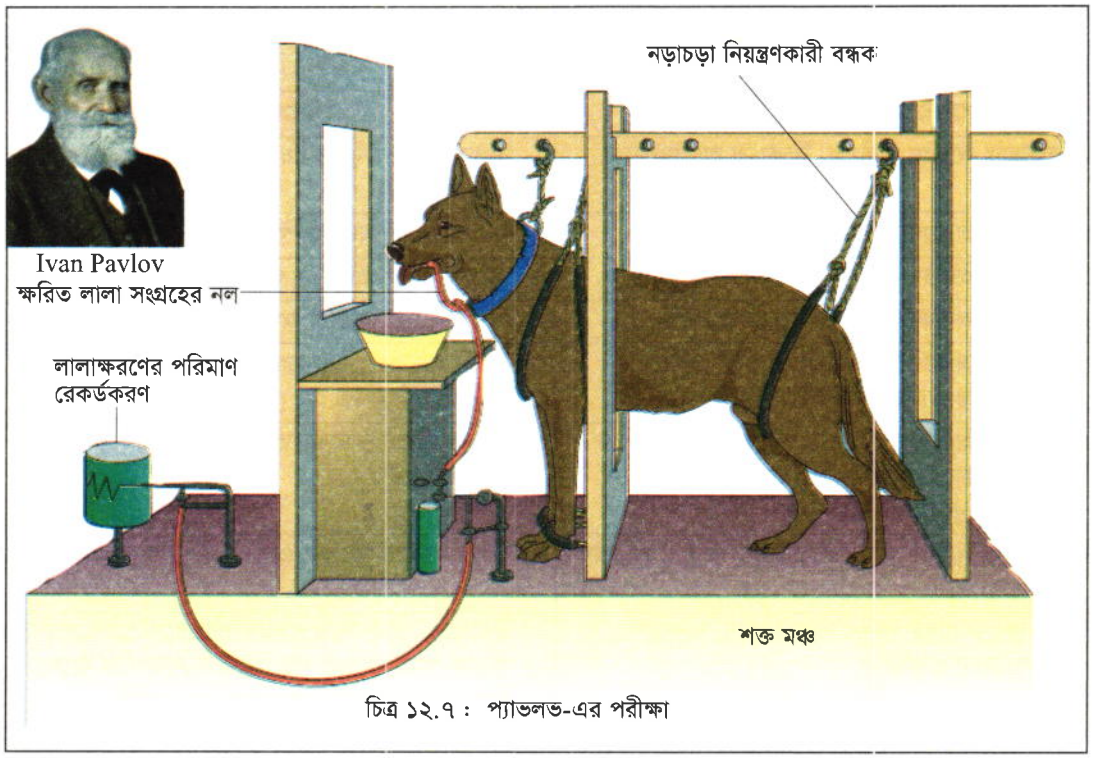

চিত্র ১২.৭ : প্যাভলভ-এর পরীক্ষা

বিজ্ঞানী প্যাভলভ গবেষণার খাতিরে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে বিশেষভাবে নির্মিত শক্ত মঞ্চে দাঁড় করিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেল্ট লাগিয়ে দিলেন যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় লালা নালির সঙ্গে একটি নলের সংযোগ করে দেওয়া হলো। খাবার হিসেবে মাংসচূর্ণ দেওয়ার পর তিনি লালাক্ষরণের পরিমাণ রেকর্ড করে রাখেন। সঠিক পরিমাণ মাংসচূর্ণ মুখে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ লালা ক্ষরণ হতে দেখা যায়। প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসচূর্ণ দেওয়ার ঠিক আগমূহূর্তে ঘন্টা বাজান। প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার (১২বার) সমলয়ে ঘন্টাধ্বনি শোনানো ও মাংসচূর্ণ সরবরাহের পরও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ ১২ বার ঘন্টাধ্বনির পর উদ্দীপনার প্রতি সাড়া পাওয়া গেছে। তখন শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের লালাক্ষরণ শুরু হয়েছে। ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে এমন সামঞ্জস্য রচিত হলো যে মাংসচূর্ণ না দিয়ে প্যাভলভ যতবার ঘন্টা বাজিয়েছেন ততবারই কুকুরে লালাক্ষরণ হয়েছে। ক্ষরণের পরিমাণ শুধু মাংসচূর্ণ দিলে যতোখানি হয় ঠিক ততোখানি।

উপরোক্ত গবেষণার আলোকে **প্যাভলোভিয়ান কন্ডিশনিং** (Pavlovian conditioning) বা **চিরায়ত সাপেক্ষণ** (classical conditioning)-কে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়ঃ

১. এমন অনেক বিষয় আছে যা একটি কুকুরের জানার প্রয়োজন নেই– এ ধারণা থেকে প্যাভলভ তাঁর গবেষণা শুরু করেন, যেমন– যখন আহার দেখবে তখন লালাক্ষরণ করবে এমন বিষয় শেখার দরকার নেই। এ প্রতিবর্ত কুকুরে নিহিত আছে। এটি একটি **অনপেক্ষ সাড়া** (unconditioned response, অর্থাৎ উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়)।

২. প্যাভলভ আবিষ্কার করেন যে খাবারের সঙ্গে এমন কিছু (যেমন- গবেষণা টেকনিশিয়ান) জড়িত রয়েছে যা অনপেক্ষ সাড়াদানকে উসকে দেয়।

৩. গবেষণা টেকনিশিয়ানের গায়ে সাদা ল্যাব-কোট প্রথমে **নিরপেক্ষ উদ্দীপনা** (neutral stimulus) ছিল। কারণ এটি কোনো **সাড়া** (response) সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ল্যাব-কোট গায়ে দেয়া মানুষটি (নিরপেক্ষ উদ্দীপনা) খাদ্যরূপী অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।

৪. প্যাভলভ তাঁর গবেষণায় একটি ঘন্টাকে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কুকুরকে খাবার দেওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ঘন্টা বাজাতেন।

চিত্র ১২.৮.: চিরায়ত সাপেক্ষণ

৫. দেখা গেল, অনেকবার পুনরাবৃত্তির পর কুকুরটি ঘন্টাধ্বনি ও খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এক নতুন আচরণে শিক্ষিত হয়েছে। যেহেতু সাড়াটি শিক্ষণজনিত (বা সাপেক্ষ) তাই একে **সাপেক্ষ সাড়া** (conditioned response) বলে। এভাবে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে **সাপেক্ষ উদ্দীপনা** (conditioned stimulus)-য় পরিণত হয়েছে।

সামাজিক আচরণ (Social Behaviour)

একই প্রজাতিভুক্ত কিছু সংখ্যক প্রাণীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে বিশেষ শৃঙ্খলার সাথে একত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপকে সামাজিক আচরণ বলে। এটি একপ্রকার সহজাত আচরণ। প্রাণিজগতের মধ্যে পিঁপড়া, মৌমাছি, বোলতা, উইপোকা, মাছ, পাখি ও প্রাইমেট স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণ দেখা যায়। এ ধরনের আচরণে একই উপনিবেশে বসবাসকারী প্রাণীরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সহযোগী।

সামাজিক আচরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রজননের জন্য একটি প্রজাতিতে যখন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া গড়ে উঠে তখন তাকে **ব্যক্তি স্তর** বলে এবং এটিই সর্বনিম্ন স্তর। আবার একই প্রজাতির কয়েকজন সদস্য (পিতা, মাতা ও সন্তান) মিলে **গোত্র স্তর** গঠন করে। এভাবে কয়েকটি গোত্র মিলে **দল স্তর** কিংবা জনগোষ্ঠী পর্যায়ে **কলোনী স্তর** ও **সম্প্রদায় স্তর** গঠন করে।

সামাজিক আচরণের বৈশিষ্ট্য : (i) এতে একই প্রজাতিভুক্ত অনেক সদস্য একসাথে বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা দেখানোর মাধ্যমে সম্পর্কিত থাকে। (ii) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সংগঠন সৃষ্টি হয় যাতে সুস্পষ্ট শ্রমের (দায়িত্বের) বণ্টন থাকে। (iii) অনেক সময় একের বেশি জনু (generation) কে একসাথে বসবাস করতে দেখা যায় (যেমন–দাদা-দাদী, বাবা-মা ও সন্তান)। (iv) সবক্ষেত্রেই সামাজিক দলের মধ্যে কোনো না কোনো সদস্যের আত্মত্যাগের ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এটি **পরার্থপরতা** বা **অ্যাল্ট্রুইজম** (altruism) নামে পরিচিত।

অ্যাল্ট্রুইজম (Altruism) : পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বা পরার্থপরতা

কতক প্রজাতির প্রাণী সামাজিক আচরণের এক পর্যায়ে স্বজাতীয় অন্যান্য সদস্যদের কল্যাণে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। **একই প্রজাতির অন্য সদস্যদের প্রতি প্রাণীর এরূপ আচরণকে অ্যাল্ট্রুইজম বা পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা বলে**। ফরাসি দার্শনিক **অগাস্ট কমটি** (August Comte) ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম Altruism শব্দটি প্রণয়ন করেন। রক্তের সাথে সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের (kin) ঘিরে এ আচরণ বিকশিত হলেও ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেও এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাণিজগতে অনেক প্রজাতিতে অ্যাল্ট্রুইজম দেখা যায়। যেমন–

১. **সামাজিক পতঙ্গ** যেমন– মৌমাছি, এরা দলবদ্ধভাবে মৌচাকে বাস করে। প্রত্যক মৌচাকে রাণী, পুরুষ ও কর্মী এ তিনজাতের মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যে কর্মী মৌমাছিরা প্রজননে অক্ষম। এরা স্ত্রী মৌমাছির যত্ন, কলোনির জন্য পরিশ্রম করে যায় এমনকি তারা বহিরাগতের আক্রমণ থেকে কলোনির সদস্যদের বাঁচাতে নিজে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

২. **বেবুন** ৬ বছর পর্যন্ত তার সন্তানকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে কাটিয়ে দেয়।

৩. জাপানি **ফলিয়েজ মাকড়সার** (*Chiracanthium japonicum*) মা বড় আকারের ডিমের পিণ্ডটি বুকে নিয়ে আগলে রাখে। ডিম ফুটে শত শত বাচ্চা মায়ের দেহকে খাবার হিসেবে ভক্ষণ করে। এভাবে মা তার বাচ্চাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে।

৪. **রক্তচোষা বাদুর** (Vampire bats) দলের যেসব সদস্য রাতে খাবার খেতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য খাবার গ্রহণকারী সদস্যরা রক্ত উদগীরণ করে খাওয়ায়।

৫. আফ্রিকার **ভারভেট বানর** (Vervet monkeys) শিকারির উপস্থিতি টের পেলে অন্যান্য সদস্যের জন্য একটি সতর্ক সংকেত প্রেরণ করে, এমনকি শিকারিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যাতে অন্য সদস্যরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে।

৬. **ডলফিন** অসুস্থ সদস্যদেরকে পানির ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করে যেন তারা পানিতে শ্বাস নেয়া চালিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

৭. বাংলাদেশের সুন্দরবনের **চিত্রা হরিণ** ও **রেসাস বানরের** অ্যাল্ট্রুইজম বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গাছের মগডালে থাকা বানরেরা বিশেষ শব্দ করে বাঘ আসার বিপদসংকেত হরিণদের দেয়। বিপদসংকেত পেয়ে হরিণেরা নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যায়। আবার হরিণদের খাদ্য সংকটের সময় বানরেরা গাছের মগডাল থেকে পাতা ও কচি ডাল ভেঙে মাটিতে ফেলে খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে।

মৌমাছির সামাজিক আচরণে অ্যাল্ট্রুইজম বা পরার্থপরতা

মৌমাছির প্রকারভেদ

মৌমাছি Arthropoda পর্বের Insecta শ্রেণির Hymenoptera বর্গের Apidae গোত্রের *Apis* গণের সামাজিক প্রাণী।

বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়–

১. ***Apis indica*** : এগুলো পাহাড়ি অঞ্চলে, সমতল ভূমি, বনে-জঙ্গলে, দালান বা ঘরের সুবিধাজনক স্থানে বাসা নির্মাণ করে। মধু সংগ্রহের জন্য এ জাতীয় মৌমাছিই কৃত্রিম উপায়ে চাষ করা হয়।

২. ***Apis dorsata*** : এগুলো গাছের শাখায় বা ফোকরে, দালানের কার্নিশে বাসা নির্মাণ করে। তবে এরা বছরে একবার পরিযায়ী হয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে যায়।

৩. ***Apis florea*** : এগুলো আকারে খুব ছোট এবং চাকটি ৬ ইঞ্চির মতো লম্বা। এরা গাছের ডালে কিংবা ঘরের কার্নিশে চাক তৈরি করে।

উপরিল্লিখিত ৩টি প্রজাতি ছাড়াও ইউরোপ ও আফ্রিকায় যথাক্রমে *Apis mellifera* ও *Apis adamsoni* প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়।

একটি মৌচাকে তিন ধরনের মৌমাছি থাকে– **১. রাণী, ২. পুরুষ ও ৩. কর্মী**। নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

১. রাণী মৌমাছি (Queen Bee) : মৌমাছির মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাণীই সমাজের মধ্যমণি। প্রতিটি মৌচাক একটি মাত্র রাণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। মৌচাকের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা রাণীর দেহ অপেক্ষাকৃত বড় (লম্বায় ১৫-২০ মিলিমিটার), পা মজবুত, উদর প্রলম্বিত, উদরের শেষ ভাগ ক্রমশ সরু। দেহের তুলনায় ডানাদুটি ছোট। এদর লালাগ্রন্থি থাকেনা। হুলে বার্ব না থাকায় এরা বার বার হুল ফুটাতে পারে। সঙ্গমের পর রাণী দিনে ১৫০০–২০০০ ডিম পাড়তে সক্ষম। ডিম নিষিক্তকরণ সম্পূর্ণরূপে রাণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। কলোনির প্রয়োজন অনুযায়ী রাণী নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম পাড়ে কিংবা নতুন কলোনি

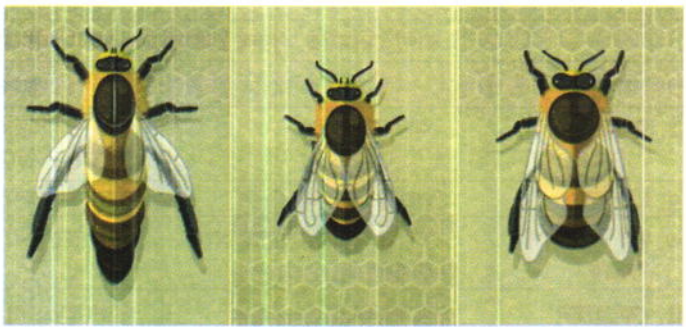

রাণী মৌমাছি কর্মী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি

চিত্র ১২.৯ : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌমাছি

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কর্মী ও পুরুষ মৌমাছিসহ অন্যত্র গমন করে। ভবিষ্যৎ রাণীর লার্ভাগুলো তরুণ কর্মী মৌমাছির গলবিলীয় ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ **রাজকীয় জেলি** (royal jelly) খেয়ে বড় হয়, ফলে রাণী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনাকে **সুপার সিডিওর** (super sedure) বলে। ১৬ দিনের মধ্যে মৌমাছিরা রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। নতুন রাণী বেরিয়ে **মৌচাকে** বিকাশরত অন্যান্য রাণীদের হুল ফুটিয়ে হত্যা করে। একই সময়ে দুটি নতুন রাণী বের হলে এরা **মরণযুদ্ধে** (duel to the death) লিপ্ত হয়। যুদ্ধে জয়ী রাণী কলোনির সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

রাণী মৌমাছি অধিকাংশ সময় মৌচাকের মধ্যে অবস্থান করে। কেবল **সঙ্গম উড্ডয়ন** (nauptial flight)-এর সময় মৌচাক থেকে বেরিয়ে আসে। এরা জীবনে একবার কয়েকশ পুরুষের সাথে সঙ্গমে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য শুক্রাণু গ্রহণ করে যা সারাজীবন ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। রাণী মৌমাছি ৩-৫ বছর বাঁচে।

কাজ : রাণী মৌমাছির প্রধান কাজ ডিম পাড়া। জীবদ্দশায় একটি রাণী মৌমাছি প্রায় দেড় লক্ষ ডিম পাড়ে। এটি কলোনির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। এর মস্তক থেকে ক্ষরিত তরল **ফেরোমন** (Pheromone = Oxydecenoid acid) মৌচাকের বিভিন্ন সদস্যদের সংঘবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে।

২. **পুরুষ মৌমাছি** (Drones) : এগুলো রাণী ও কর্মী মৌমাছির মাঝামাঝি আকৃতির (১৫–১৭ মিলিমিটার লম্বা), প্রশস্ত ও সুগঠিত দেহ, বৃহৎ চোখ বিশিষ্ট। এদের মোমগ্রন্থি, পরাগ সংগ্রাহক যন্ত্র এবং হুল থাকেনা। কলোনিতে ৩০০–৩০০০ পর্যন্ত পুরুষ মৌমাছি থাকে। অনিষিক্ত ডিম থেকে **পার্থেনোজেনেসিস** (parthenogenesis) প্রক্রিয়ায় পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টি হয়। সেজন্য এরা **হ্যাপ্লয়েড** (n) প্রকৃতির হয়ে থাকে।

কাজ : পরিণত পতঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার ১০ দিন পর এরা রাণীকে নিষিক্ত করতে সক্ষম হয়। প্রায় ৫০০ পুরুষ সঙ্গম উড্ডয়নে অংশ গ্রহণ করে। সঙ্গমই পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ। এরা জীবনে কেবল একবার রাণী মৌমাছির সাথে যৌন মিলনের আকাঙ্খায় অপেক্ষা করে এবং মিলনের পর মৃত্যুবরণ করে।

৩. **কর্মী মৌমাছি** (Workers) : যেসব স্ত্রী লার্ভা কেবল মধু ও বি-ব্রেড খেয়ে বড় হয় তারা বন্ধ্যা কর্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়। এগুলো সংখ্যায় সর্বাধিক (৬০,০০০ – ৮০,০০০) এবং কলোনির ক্ষুদ্রতম সদস্য। এদের ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয় না, তাই বন্ধ্যা অর্থাৎ প্রজননে অক্ষম। এদের ডানাদুটি বেশ মজবুত হয় ফলে দ্রুত ডানা সঞ্চালন করতে পারে, পায়ে **পরাগ সংগ্রহের থলি** বা **পরাগঝুড়ি** (pollen basket) এবং **রেণু চিরুনি** (pollen comb) থাকে। এদের উদরের অঙ্কীয়দেশে মোম নিঃসরণের জন্য **মোমগ্রন্থি** (wax gland) থাকে। দেহের শেষভাগে হুল এবং মস্তকে একটি **শোষক নল** বা **দীর্ঘ প্রোবোসিস** (probosis) রয়েছে। এদের আয়ুষ্কাল গড়ে ৫০ দিন। বসন্ত ও শীতকালে কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত থাকায় আয়ু কমে যায়। এ সময় মাত্র ৬ সপ্তাহ জীবিত থাকে।

কাজ : শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকের যাবতীয় কাজ করে। যেমন: মৌচাক নির্মাণ, নারী ও পুরুষের সেবা, মধু ও মকরন্দ বা পুষ্পসুধা সংগ্রহ, মৌচাক পাহারা দেয়া, চাক পরিষ্কার রাখা এবং সন্তান-লালন-পালন করা।

রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	রাণী মৌমাছি	পুরুষ মৌমাছি	কর্মী মৌমাছি
১. আকার	আকারে বড়।	আকারে কিছুটা ছোট। তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে সবচেয়ে ছোট।
২. প্রজনন	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে অক্ষম।
৩. মধু ও পরাগ সংগ্রহ	মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৪. ফেরোমন	ক্ষরণ করে।	ক্ষরণ করে না।	ক্ষরণ করে না।
৫. আয়ুষ্কাল	প্রায় ৩-৫ বছর।	প্রায় ৫০-৬০ দিন।	প্রায় ৫০ দিন।
৬. প্রতি মৌচাকে সংখ্যা	একটি।	৩০০ – ৩০০০	৬০-৮০ হাজার।

রাজকীয় জেলি (Royal jelly) : এটি কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত সাদা বর্ণের পুষ্টিকর খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়। এর রাসায়নিক উপাদান হলো: পানি ৬০%–৭০%, প্রোটিন ১২%–১৫, লিপিড ৩%–৬%, চিনি ১০%–১৬%, ভিটামিন ২%–৩%, লবণ ও অ্যামিনো এসিড। তবে ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু আবহাওয়ার উপর এ উপাদানের পরিমাণ নির্ভরশীল। প্রোটিন ও অ্যামিনো এসিড সমৃদ্ধ হওয়ায় এ জেলি ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহৃত হয়।

মৌমাছির সামাজিক সংগঠন (Social Structure of Honey Bee)

মৌমাছি সামাজিক প্রাণী। একেকটি বড় পরিবার গড়ে বা বসতবদ্ধ হয়ে মৌচাকে বাস করে। প্রত্যেক কলোনিতে মৌমাছির ৩টি সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সামাজিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলে। একটিমাত্র রাণীর নেতৃত্ব কয়েকশ ড্রোন (বা পুরুষ মৌমাছি) এবং ৬০–৮০ হাজার কর্মী মৌমাছি (বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি) যে সুশৃঙ্খল উপায়ে নীরবে নিভৃতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা লক্ষ বছর ধরে মানুষ জানবার চেষ্টা করেছে। তাদের এ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মৌমাছি গোষ্ঠীর সকল মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে প্রাণিজগতে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে মৌমাছিরা দৃঢ় সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বাস করে।

১. **শ্রম বন্টন :** কর্মীদের মধ্যে অস্থায়ী দায়িত্ব বন্টন মৌমাছি কলোনির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কর্মী মৌমাছির আচরণ সাধারণত বয়স, চাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কলোনিবাসীর জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী মৌমাছিদের শৈশব বলতে কিছু নেই। ৩-৪ দিন বয়সেই তারা চাকের মধু-কুঠুরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। ১৮–২০ দিন বয়স হলে মধু আহরণে বের হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা রক্ষী হিসেবে বাসা পাহারা দেয়। শেষ বয়সে কর্মী মৌমাছি পানি বহন করে, অবসর যাপন করে এবং বেশি দূরে যায় না। বিবর্তনের গতিপথে তারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী হয়েছে, যথা– বহিঃপরিবেশগত অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে কলোনির স্বার্থে বয়স নির্বিশেষে সবাই এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক সময় বাইরে অবস্থানরত মৌমাছিরা ঝড়-বাদলে আটকা পড়ে কলোনিতে ফিরতে পারে না, কিংবা শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় অনেকে মারা গেলে বয়স অনুযায়ী কাজের ধারা বিঘ্নিত হয়। তরুণ সদস্যরা সুধা আহরণের গতিকে কখনও ছিন্ন হতে দেয় না।

২. **খাদ্যের যোগান :** যে কোনো সমাজের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। মৌ-নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপোসহীন। দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ করে শীতকালে এবং প্রতিদিনকার খাদ্যের সংস্থান ও মজুত গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক কলোনির অগণিত কর্মী মৌমাছি সকাল-সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। মৌচাকের এক নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের জন্য এবং ভাবী বংশধরদের জন্য খাদ্য জমিয়ে রাখে।

চিত্র ১২.১০ : মৌমাছির নৃত্য

৩. **ভাব বিনিময় :** সুশৃঙ্খলতাই একটি জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাঠি। মৌমাছির কলোনি প্রাণিজগতের অন্যতম সুশৃঙ্খলতম ও আদর্শ গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। মৌমাছিরা তাদের ভাবাবেগ কিছুটা প্রকাশ করে গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে গন্ধবস্তু ও বিশেষ **নৃত্য-ভঙ্গিমায়**।

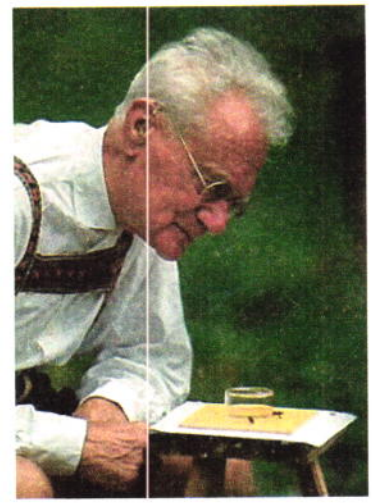
Karl von Frisch (1886 - 1982)

মৌমাছির নৃত্যকে **মৌমাছির ভাষা** (bee language) বলে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানি **কার্ল ফন ফ্রিস** (Karl von Frisch) মৌ নৃত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। এ জন্য তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। মৌমাছির নৃত্য দু'প্রকারের – **চক্রাকার নৃত্য** (round dance) এবং **ওয়াগল নৃত্য** (waggle dance)। চক্রকার নৃত্যে কতগুলো বৃত্তাকার গতিপথের সৃষ্টি হয়। এ নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছিরা বাসা থেকে ১০০ মিটারের কম দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করে। অন্যদিকে ওয়াগল নৃত্যে এমন গতিপথ সৃষ্টি হয় যা একটি ইংরেজী "8" অক্ষরের মতো দেখায়। এ নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছি বাসা থেকে ১৫০ মিটারের বেশি দূরত্বের কোনো খাদ্যের উৎস সম্পর্কে অন্য সদস্যদের অবহিত করে। রাণী মৌমাছির ত্বক-নিঃসৃত হরমোনের গুণযুক্ত এসিড চাকের সবখানে বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট ধরনের গতিবিধি বা মৌ-নৃত্য কলোনির মৌমাছিদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান উপায়। সন্ধানী কর্মী মৌমাছির দেহে লেগে থাকা সুধা ও পরাগ দেখে খাদ্যের ধরণ সম্বন্ধেও মৌমাছিরা অবহিত হয়।

৪. **পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা :** বিবর্তনের গতিপথে মৌমাছিরা অনেক রোগ প্রতিরোধের উপায় করে নিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধের উপায় না থাকলে সামান্য মাত্রায় দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। দেহের কাইটিনময় আবরণে আছে অ্যান্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন পদার্থ যা ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি দমন, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। মৌরুটি, মধু, এমনকি মৌচাকেও আছে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ। মৌমাছিরা বাসা ও মৌচাকের প্রাচীর প্রোপেলিশ (বা মৌসিরিশ) নামে যে এক ধরনের জৈব রেজিনের প্রলেপ দিয়ে রাখে তাও ক্ষতিকারক অণুউদ্ভিদ-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভাকে চাকের বাইরে ফেলে দিয়ে মৌমাছিরা সম্ভাব্য সংক্রমণ থেকে কলোনিকে রক্ষা করে। ঋতুভেদে চাকে তাপের তারতম্য ঘটে থাকে। মোমে গঠিত মৌচাক প্রায় তাপ অপরিবাহী হওয়ায় চাকে সব সময় তাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে মৌমাছিরা মৌচাকের প্রবেশ মুখে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ হয়ে সবার মাথা একদিকে রেখে ডানা ঝাঁপিয়ে ভিতরে শীতল বাতাস সঞ্চালন করে।

৫. **প্রতিরক্ষা :** মৌমাছি খুবই শান্তিপ্রিয়। অকারণে আক্রমণ করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ-মধু অবৈধভাবে সংগ্রহের উদ্দেশে আণুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত অনেকেই চাকে হানা দেয়। তাদের প্রতিহত করতে প্রকৃতি মৌমাছিকে হুল নামক মারাত্মক বিষাক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। একটি হুলের দংশন যে কোনো পতঙ্গ বা ইঁদুরজাতীয় ক্ষুদ্রদেহী স্তন্যপায়ীর মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট।

৬. **সোয়ার্মিং ও জিনগত উন্নতি সাধন :** কলোনি-বিভক্তির মাধ্যমে মৌমাছিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যাধিক্য ঘটলে স্থানাভাবসহ আরও অনেক কিছুরই অভাব দেখা দেয়। তখন রাণী মৌমাছি কিছু কর্মী মৌমাছির চাপে নতুন আবাস গড়ার উদ্দেশে চাকের প্রায় অর্ধেক কর্মী মৌমাছিসহ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। এ প্রক্রিয়াকে **সোয়ার্মিং** বলে। পরিত্যক্ত চাকে নতুন রাণী পরিস্ফুটিত হয়। নতুন রাণী কয়েকটি পুরুষ অনুগামীসহ নাপসিয়াল উড্ডয়ন-এ পুরুষ (ড্রোন) মৌমাছির পর্যাপ্ত শুক্রাণু সংগ্রহ করে চাকে ফিরে আসে। সংগৃহীত শুক্রাণু দিয়ে রাণী আজীবন যত ডিম পাড়ে তার সবগুলোকেই নিষিক্ত করতে পারে। তাই রাণী জীবনে একবারই মাত্র সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ডিম পাড়বার সময় রাণী ইচ্ছানুযায়ী ডিম নিষিক্ত করে। চাকের প্রয়োজনে নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম প্রসবিত হয়। অনিষিক্ত ডিম থেকে

পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম থেকে কর্মী মৌমাছি বা ভাবী রাণী মৌমাছির সৃষ্টি হয়। এর ফলে একদিকে, কলোনিতে জনবিস্ফোরণ রোধ হয় ও খাদ্য আহরণ ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে ভাবী বংশধরের জিনগত পটভূমিও উন্নত হয়। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিতে সম্ভবত মৌমাছিরা সংরক্ষণ ও সাফল্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে।

৭. **জনগণতান্ত্রিকতা :** একটি কলোনিতে রাণীই প্রধানতম ব্যক্তিত্ব। রাণীর উপরই নির্ভর করে একটি চাকের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও ক্ষমতা, জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও কর্মশক্তি। সমগ্র মৌমাছি গোষ্ঠীকে রাণীই পরিচালনা করে। তাই রাণী মৌমাছিকে একটি জাতির সম্রাজ্ঞী, এমনকি দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তা সত্ত্বেও রাণীর অনেক কাজই কলোনির অন্যান্য সদস্যের সিদ্ধান্তে করতে হয়। যেমন- উপযুক্ত সময় এবং মৌমাছিদের সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া রাণী একটি ডিমও পাড়ে না। জন্মগত বিরোধিতার কারণেই রাণী কখনও শূন্য রাণী কুঠুরিতে ডিম পাড়ে না, কিন্তু অন্যেরা তাকে সে কাজেই বাধ্য করে। সোয়ার্মিংয়ের সময়ও রাণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাস্তুত্যাগে উৎসাহী মৌমাছিদের চাপে চাক ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। রাণী অন্যান্য মৌমাছিদের কাছ থেকে যেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করে, রাণীও তার বিনিময়ে খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান ও মৌমাছিদের সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে নেতৃত্বে বহাল থাকে। অপরদিকে ভবিষ্যৎ সোয়ার্মিং- এ অংশগ্রহণকারীদের চাপে শূন্য রাণী কুঠুরিতে ভাবী রাণী সৃষ্টির উদ্দেশে ডিম পেড়ে গণতন্ত্রের সুবাতাস প্রবাহেও সাহায্য করে। এ কারণেই মৌমাছির কলোনি একদিকে চিত্তাকর্ষক, অনুসরণীয়, অন্যদিকে, স্বৈরাচারদের জন্য এক ঈর্ষণীয় সমাজবন্ধন।

৮. **উত্তরাধিকার নির্বাচন :** মৌচাকে রাণীর মৃত্যু হলে মৌমাছিদের মধ্যে আতংকের ভাব ফুটে উঠে। রাণী ছাড়া মৌমাছিরা বাঁচতে পারে না বলে তারা তিন দিন বয়সের এক বা একাধিক ডিম বেছে নিয়ে সুপ্রশস্ত খোপে রেখে দেয়। রাণী হিসেবে নির্বাচিত লার্ভাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত **রাজসিক জেলি** খাওয়ানো হয় বলে সেটি রাণী মৌমাছিরূপে বেড়ে উঠে। এভাবে ষোল দিনের মধ্যে মৌমাছিরা নতুন রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

৯. **রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ :** অনুচর কর্মী মৌমাছিরা রাণীর পরিচর্যা করে। রাণীর দেহ পরিষ্কার করা, শরীর আঁচড়ানো, মৌচাক থেকে মল অপসারণ ও পুষ্টিকর রাজসিক জেলি খাওয়ানো তাদের কাজ। রাণী মৌচাকের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে আজীবন এক অটুট সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তাই বলে রাণীর জুলুম-নির্যাতন ওরা মুখ বুজে সহ্য করে না, বরং আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাণী-মৌমাছিকে হয় তাড়িয়ে দেয় নয়তো মেরে ফেলে। এভাবে একেকটি চাকের মৌ-সমাজ টিকে থাকে।

১০. **চুরি-ডাকাতি :** একটি জাতি যখন অসতর্ক ও বিশৃঙ্খল থাকে, সে সুযোগে বহিঃশত্রু কীভাবে অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় তাও মৌমাছি-কলোনির অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। যে কোনো তুচ্ছ ব্যাঘাতের কারণে কলোনি-জীবনের ঐকতান ছিন্ন হয়ে যায়, চাকে ও মাঠে কাজের ছন্দপতন ঘটে। তখন খোলা চাক থেকে মধুর কড়া গন্ধ ছড়াতে থাকে। মৌমাছিরা শত শত মিটার দূর থেকে এ গন্ধ পায়। খোলা চাকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মধুর গন্ধে বিমোহিত হয়ে অন্য চাকের মৌমাছিরা দ্রুত যাত্রাপথের পরিবর্তন ঘটিয়ে রক্ষীবিহীন, অরক্ষিত প্রবেশ পথের ভেতর দিয়ে চাকে প্রবেশ করে, এবং আকুণ্ঠ মধু পান করে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চাকে ফিরে যায়। ফেরার আগে অঞ্চলটি চিনে রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। এখানে একটি খোলা চাক আছে এমন সংকেতও দিয়ে যায় যাতে অন্যরা মধু লুট করতে পারে।

মৌমাছির সামাজিক জীবনযাত্রা এমনই চিত্তকর্ষক, তাদের আচরণ ও কাজের বৈচিত্র্য এমন বিস্ময়কর যা দেখলে মনে হবে মানুষের মতো মৌমাছিরও হয়তো আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা আছে, আছে আত্মত্যাগের মনোভাব। মৌমাছির সামাজিক জীবন এভাবে মানুষকে লক্ষ বছর ধরে ভাবিত করে রেখেছে, এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

এ অধ্যায়ের প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ (Recapitulation)

১. বাহ্যিক কিংবা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার কারণে প্রাণিদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশকে আচরণ বলে।

২. প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণিদের আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে ইথোলজি বা আচরণ-বিদ্যা বলে।

৩. প্রাণিদেহে যার কারণে উদ্দীপনা ঘটে তাকে বলে উদ্দীপক। দেহে যে পরিবর্তনের কারণে ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু উদ্দীপিত হয় তাই উদ্দীপক।

৪. পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনার প্রতি উপযুক্ত সাড়া প্রদর্শনের জন্য জীবদেহের অবস্থানের পরিবর্তনজনিত উপযোজনকে ওরিয়েন্টেশন বলে। ওরিয়েন্টেশন জীবের অভিযোজিত আচরণের এক সরল অবস্থা। অন্যকথায়, ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে কোনো উদ্দীপকের প্রভাবের ফলে দেহকে সরিয়ে বা ঘুরিয়ে মানানসই অবস্থায় নেওয়া।

৫. উদ্দীপকের প্রভাবে অবিরত এবং সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত ওরিয়েন্টেশনকে ট্যাক্সিস বলে। অর্থাৎ উদ্দীপকের উৎসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দেহ অক্ষের অবস্থানগত পরিবর্তনের নাম ট্যাক্সিস। এক্ষেত্রে চলনের সঙ্গে ট্যাক্সিসের যৌথ কার্যকারিতায় উদ্দীপকের উৎসের প্রতি, উৎস থেকে দূরে বা নির্ধারিত কোণে প্রাণীর দৈহিক অবস্থানের পরবর্তন ঘটে।

৬. কোন উদ্দীপকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেশি বা কোন অঙ্গে যে অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা রিফ্লেক্স অ্যাকশন বলে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে প্রতিবর্ত চক্র নামক এক বিশেষ সংক্ষিপ্ত স্নায়ুপথ দিয়ে ঘটে থাকে।

৭. যেসব প্রতিবর্ত ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের সহজাত বা অনপেক্ষ প্রতবর্ত ক্রিয়া বলে।

৮. যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের ফলে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের অর্জিত বা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে।

৯. জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতি রক্ষায় বংশপরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে সেটি সহজাত আচরণ বা ইনসটিংক্ট।

১০. স্থায়ী বাসভূমি থেকে নতুন কোনো অনুকূল পরিবেশে যাত্রা এবং যেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় স্থায়ী বসতিতে প্রত্যাগমনকে পরিযান বা মাইগ্রেশন বলে।

১১. যে প্রক্রিয়া একেক সদস্যের আচরণের অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযোজনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে প্রক্রিয়া শিখন নামে পরিচিত।

১২. যে আচরণে প্রাণী শুধু নতুন উদ্দীপনায় অভ্যস্তই হয়না, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা বর্জনেও উদ্যোগী হয় তাকে অভ্যাসগত আচরণ বলে।

১৩. শৈশবে প্রত্যেক প্রাণীর মগজে যা কিছু মুদ্রিত (imprint) হয় পরবর্তীতে তার আলোকেই সে বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে থাকে। তাকে অনুকরণ বলে।

১৪. সংহতি, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতার ভিত্তিতে বসবাসের জন্য যে আচরণ প্রকাশিত হয় সেটি সামাজিক আচরণ।

১৫. প্রাণীর জিন নির্ধারিত যেসব আচরণধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রজাতির অপর কোনো সদস্যকে না দেখেই বা অন্যের কাছ থেকে না শিখেই প্রকাশিত হয় তাকে নির্ধারিত ক্রিয়া ধারা বা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন (FAP) বলে।

১৬. প্রতিকূল পরিবেশ ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য পিতা-মাতা কর্তৃক ডিম ও অপত্য (শিশু) সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালন করাকে অপত্য যত্ন বা বাৎসল্য আচরণ বলে।

১৭. রাজকীয় জেলি হচ্ছে কর্মী মৌমাছির হাইপোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত ভিটামিন, প্রোটিন ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ এক ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য যা রাণী মৌমাছিকে লার্ভা দশায় ও পূর্ণাঙ্গ দশায় খাওয়ানো হয়।

১৮. কতক প্রজাতির প্রাণী সামাজিক আচরণের এক পর্যায়ে স্বজাতীয় অন্যান্য সদস্যদের কল্যাণার্থে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। একই প্রজাতির অন্য সদস্যদের প্রতি প্রাণীর এরূপ আচরণকে অ্যাল্ট্রুইজম বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শব্দের প্রতি সাড়া দেয়া–
ক Rheotaxis খ Aerotaxis
গ Phonotaxis ঘ Geotaxis

২. প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
ক জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয় খ সাড়া দান করে
গ আচরণ সবসময় একই হবে ঘ অনুকরণজনিত

৩. রিলিজিং উদ্দীপনার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ?
ক প্রাণীর চলন ঘটায় খ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হতে পারে
গ সাধারণ উদ্দীপনা ঘ আচরণগত সাড়ার সমাপ্তি ঘটায়

৪. কোন ধরনের প্রতিবর্ত স্বয়ংক্রিয় ?
ক অর্জিত প্রতিবর্ত খ ডিপ প্রতিবর্ত
গ সুপারফিসিয়াল প্রতিবর্ত ঘ ভিসেরাল প্রতিবর্ত

৫. ভরপেট না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পাকস্থলি পূর্ণ হলে খাওয়া বন্ধ করা–
ক প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা খ সমাপ্তিকরণ উদ্দীপনা
গ নির্গমন উদ্দীপনা ঘ সাংকেতিক উদ্দীপনা

৬. অতিজটিল ও অপরিবর্তণীয় আচরণগত প্যাটার্ণের ফলশ্রুতি–
ক সহজাত আচরণ খ শিক্ষণ আচরণ
গ অনুকরণ ঘ প্রতিবর্ত ক্রিয়া

৭. টুনটুনি পাখির বাসা নির্মাণ–
ক Taxis খ Instincts গ Migration ঘ Reflexes

৮. FAP এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. সার্বজনীনতা ii. সৃজনশীলতা iii. উদ্দেশের একনিষ্ঠতা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. শীতের পাখির পরিযানের গুরুত্ব হিসেবে বিবেচিত–
i. বিভিন্ন প্রজাতির মিলনে জিনসংযুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়
ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়
iii. আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. তিনকাঁটা স্টিকলব্যাক পুরুষ মাছের বৈশিষ্ট্য–
i. শীতকালে প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়
ii. পিতা ও মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করে
iii. ডিম না ফোঁটা পর্যন্ত ফ্যানিং কার্য চালিয়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. প্যাভলোভিয়ান কন্ডিশনিং- এ যে সমস্ত বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ–
i. অনপেক্ষ সাড়া ii. সাপেক্ষ সাড়া iii. নিরপেক্ষ উদ্দীপনা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত–
i. এটি অর্জিত ii. বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না
iii. মস্তিষ্কের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে বসবাস করে। এদের মধ্যে–
i. পুরুষ মৌমাছি প্রজনন ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশ নেয়
ii. রাণী মৌমাছি ডিম পাড়ে ও নেতৃত্ব দেয়
iii. কর্মী মৌমাছিরা কেবল কর্মে অংশ নেয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিমুল দেখল কর্মী মৌমাছিগুলো কিছু তরুণ মৌমাছিকে খাওয়াচ্ছে। মৌমাছির এ আচরণ অবশ্যই কোন একটি উদ্দীপনার প্রতি সাড়াদানকে প্রমাণিত করে।

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্দীপনার কারণ কী ?
ক তরুণ মৌমাছি কর্তৃক ফেরোমন নিঃসরণ
খ তরুণ মৌমাছির অ্যান্টেনার সংস্পর্শে সৃষ্ট উদ্দীপনা
গ তরুণ মৌমাছির প্রতি আকর্ষণ
ঘ তরুণ মৌমাছির অ্যান্টেনায় রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি

১৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণীর সমাজবদ্ধতার বৈশিষ্ট্য–
i. প্রতিরক্ষা ii. জন ও গণতান্ত্রিকতা
iii. উত্তরাধিকার নির্বাচন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ
৬. ক	৭. খ	৮. খ	৯. ঘ	১০. গ
১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. খ	১৫. ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

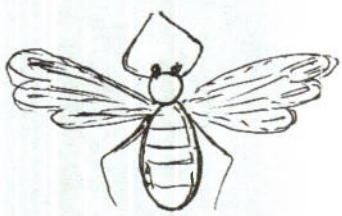

ক) ট্যাক্সিস কী ? ১
খ) ইন্সটিংক্টস বলতে কী বোঝায় ? ২
গ) উদ্দীপকে প্রাণীটির শ্রম বন্টন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণী কর্তৃক শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আলোচনা কর। ৪